নীরব প্রাণের দেবতা

ডঃ দীপক চন্দ্র

প্রচারবিমুখ শিল্পী
দেবদত্ত নন্দী
প্রিয়বরেষু

কোথাও যাওয়ার আগে দীর্ঘদিন ধরে তার পরিকল্পনা চলে মনের অভ্যন্তরে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে অমরনাথ যাত্রাটা ভেবেচিন্তে হয়নি। হঠাৎ হয়ে গেল। শারীরিক কারণে অমরনাথ যাত্রার কথা চিন্তা করতাম না। তবু কী আশ্চর্য, ভাববার অবসর না দিয়ে অমরনাথ যাত্রার ডাক এল।

কথায় বলে, তীর্থদেবতা নিজে না ডাকলে তীর্থদর্শন হয় না। সত্য-মিথ্যে জানি না। নিছকই একটি প্রবাদ বাক্য। লোকের বিশ্বাস প্রবাদ বাক্য মিথ্যে হয় না। কারণ সব প্রবাদই হল লোক জীবনের বহু অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সঞ্চিত ফসল, অতএব সত্য। অন্তত, আমার ক্ষেত্রে তা মিথ্যে হল না। নইলে, বিনামেঘে বজ্রপাতের মত মদনবাবু অমরনাথ যাওয়ার বার্তা নিয়ে আমার বাড়ি আসবেন কেন। ভদ্দরলোক আমার নৈনিতাল, আলমোড়া, রানীখেত, মায়াবতী, পাতাল ভুবনেশ্বর সফরের সঙ্গী ছিলেন। সেই সুবাদে বড় আশা করেই এসেছেন। অতএব তাঁকে বিমুখ করার ইচ্ছে ছিল না গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী ইলার। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই স্ত্রীর ভেটো অধিকার প্রয়োগ করলেন। আমার কোনো অজুহাত শুনল না। উল্টে দু'কথা শোনাল। বলল, কতকাল মানস ভ্রমণ করে লোক ঠকাবে আর? একবার নিজের চোখে জায়গাগুলো দেখো। 'বিদ্রোহিণী নিবেদিতা' লেখার সময় অমরনাথ যাত্রার অভিজ্ঞতা ছিল না বলে কপাল চাপড়িয়েছ আগে। 'ভারততীর্থে নিবেদিতা' লেখার সময় নৈনিতাল, রানীক্ষেত, আলমোড়া, মায়াবতীর পথ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকার জন্য হা-হুতাশ করেছ। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান নিয়ে লেখার সময় আবার তো মাথার চুল ছিঁড়বে। তার চেয়ে বরং নিজে গিয়ে ভালো করে দেখেশুনে এস।

গৃহিণীর অভিযোগের প্রত্যুত্তরে কিছু একটা না বললেই নয়। বিজ্ঞের মত তাই বললাম : বিবেকানন্দ নৈনিতাল আলমোড়া, রানীক্ষেত, মায়াবতী কিংবা অমরনাথ গেছেন এক'শ বছর আগে। এত বড় একটা লম্বা সময়ের মধ্যে পাহাড়ের রূপরঙ, কত বদলে গেছে। পর্যটন কেন্দ্র হওয়ার জন্য প্রতিদিন তার সাজ বদল হচ্ছে। কোথাও কোনো সাদৃশ্য নেই। অমিল সর্বত্র। ওইসব জায়গায় না গিয়েও যেভাবে আমি তার দৃশ্যপট বইতে ফুটিয়ে তুলেছি, তার সঙ্গে আমার দেখার কোনো তফাত নেই। এমন কি তার সঙ্গে স্থানগুলির ভৌগোলিক বিরোধও নেই। শুধু দৃশ্যপট বদলে গেছে, যাতায়াতের রাস্তার উন্নতি হয়েছে। এখন এ সব জায়গায় মোটরে যাওয়া যায়। কিন্তু অমরনাথ হল সম্পূর্ণ পায়ে হাঁটা পথ। অতখানি দুর্গম এবং বিপদসংকুল পথের কষ্ট আমার শরীর সইতে পারবে তো! কী দরকার ছিল বল? অমরনাথে তো আমার মানসভ্রমণ হয়ে গেছে, নতুন করে সেখানে আর কী দেখব?

ইলা বলল : দেখার কোন শেষ নেই। একই জিনিসকে কতভাবে কতদিক থেকে দেখা যায়। চোখের দেখাই যে মনের দেখা হয়ে ওঠে তোমার চেয়ে সে কথা বেশি কে জানে?

ম্যাডাম, মন যদি নিজ নিকেতন ছেড়ে বেরোতে না চায় তা হলে চোখের দেখা শুধু দেখা হয়েই থাকে। দেহটা মন আর চোখকে বয়ে বেড়ায়। অনুভূতি নিংড়ে আমি কল্পনায় যে অমরনাথকে এঁকেছি হয়তো বাস্তবে কোথাও নেই। মিছেই স্বপ্নভঙ্গ হবে। স্বপ্নের পাহাড় বাস্তবে হয়তো কোথাও নেই।

তবু যেতে হবে। বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলল। কারণ, তোমার সব লেখার পটভূমিই হচ্ছে হিমালয় অধ্যুষিত অঞ্চল। ভৌগোলিক রূপ তো অবিকৃত আছে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার সাজ বদলেছে। পাল্টেছে রূপ। কিন্তু আর সব ঠিক আছে।

কথার মধ্যে ফোঁস করে উঠলাম আমি। কে বলল তোমায়? পরিবেশের ভারসাম্য ভেঙে পড়েছে। তার ফলে দূষণ বাড়ছে। সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। মানুষের ভিড়ে পাহাড় শ্রীহীন হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের সেই শান্ত, সৌম্য, ধ্যান-মৌন রূপ আর নেই।

মদনবাবু বললেন : বাবা অমরনাথ কিন্তু আপনার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আছেন।

ইলা বলল : তবে তোমার সাধ্য কী ঘরে থাকা? তিনিই ডেকে নেবেন।

গৃহিণীর মন ভেজানর জন্য স্ত্রী অনুরক্ত স্বামীর মত বললাম : তোমাকে ছাড়া যাই কী করে? একা যেতে ভালো লাগে না। অমন যে বিধাতা পুরুষ তাঁরও একা থাকতে

ভাল লাগল না। তাই নিজেকে দুই করলেন। দু'জন না হলে রসভোগ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, একা গায়কের নহে তো গান। গাহিতে হবে দুইজনে। তোমায় না হলে আমার অমরনাথ দর্শন সম্পূর্ণ হবে না। রূপে, রঙে, রসে, ভরে উঠবে না আমার কল্পনা।

থমথমে গলায় ইলা বলল : স্বামীর সঙ্গী হতে কোন স্ত্রীর না ইচ্ছে করে? কিন্তু আমি গেলে তোমার শয্যাশায়ী পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসহায় মাকে দেখবে কে? আমায় দেখতে না পেলে মানুষটা গুমরে গুমরে কেঁদে মরবে। প্রাণ থাকতে আমি তা পারব না।

বুকের গভীর থেকে উঠে আসা কথাগুলো শুনে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। প্রত্যুত্তরে বলবার কিছু ছিল না। তাই নানাভাবে যাত্রা পণ্ডের চেষ্টা করেছি। কিন্তু সফল হয়নি প্রচেষ্টা। যে অদৃশ্য দেবতার হাতে ঘুড়ির সুতো, তিনি যেমন ঘুড়িকে স্বর্গে পৌঁছে দিতে পারেন তেমনি ভোঁ কাটা করে আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধাকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারেন। আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু নেই। তিনিই সব। বাধা-বিপত্তির দোলায় দুলছে মন।

যাত্রা করা পর্যন্ত চলল এই নাটক।

অবশেষে ইলা আমায় প্রবোধ দিয়ে বলল : ছেলেমানুষী করো না। একজন পর্বত অভিযাত্রীর সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ যখন পেয়েছ নির্ভাবনায় চলে যাও। আমিও নিশ্চিন্তে থাকতে পারব। তোমার চোখ দিয়ে আমি অমরনাথ দেখব। আমি থাকব তোমার কল্পনায়। তোমার সর্বক্ষণের ভাবনায়, চিন্তায়। তাহলে তো তুমি আর একা হলে না। আমার থেকে আলাদা হয়েও থাকলে না। ওই বিশাল বিস্তৃত হিমালয় পাহাড়ের অরণ্য, গাছগাছালি, মনোরম নদী, ঝরনা, বহুবর্ণ প্রকৃতির নীল আকাশ, মেঘলা আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তারা এবং অগণিত তীর্থযাত্রীর সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে যাবে। যখন বহুর সঙ্গে তোমার সত্তা মিলিত হবে তখন তুমি আর একা নও, আলাদা নও, আবার আমার থেকে বিচ্ছিন্নও নও। আমার বাসনা পূরণের জন্য তোমার অতল গভীর মানস বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন উৎসুক হয়ে তাকে আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে। তোমার দেখায় দেবতাত্মা হিমালয় এক বিরাট জীবনস্রোতের অংশ হয়ে আমার সামনে প্রতিভাত হবে। আমার দেখার চেয়ে সে দেখা অনেকগুণ বড় হয়ে উঠবে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। কী আশ্চর্য, সুন্দর ওর চাহনি। মনে হল, শান্ত, মন খারাপ করা আর্তি বুকে, মুখে, চোখে শরীরের অণুতে অণুতে ধরে রেখে

আমার দিকে কী গভীর প্রত্যাশায় চেয়ে আছে। আমার অবাধ্য দুটি চোখ ওর চোখের ওপর এমন করে মেলে ধরল যেন একটুও চোখ উপচে সে চাহনি বাইরে পড়ে অপচয় না হয়।

অগত্যা অনিচ্ছা ত্যাগ করতে হল। জানি না, কার ডাকে আমার যাত্রা সত্যি সম্ভব হল। পাহাড়ের টানে পাহাড় দেখতে বেরোইনি, আবার বাবা অমরনাথের কোনো ডাক হৃদয়ে শুনতেও পাইনি। তবু, তাঁর হাতছানিই আমাকে ডেকে নিয়ে গেল অমরনাথের পথে।

কথায় বলে, ভক্তের বোঝা ভগবান বয়। আমার বোঝা বইবার জন্য বাবা অমরনাথের ভক্ত বেচারী মদনবাবু ছিলেন। নিজে থেকে রেলের টিকিট, জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটন অফিস থেকে অমরনাথ যাত্রার অনুমতিপত্র নেওয়ার সব ঝক্কি মদনবাবুই করলেন। এমন কি মালপত্তর গুছিয়ে নেওয়ার জন্য নিজের একটা রুকস্যাকও দিলেন। তাও আবার ঘাড়ে করে বাড়ি বয়ে দিয়ে গেলেন। কী জানি, এও বোধহয় বাবা অমরনাথের মহিমা। আমায় নইলে হে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে। এরকম কোনো ব্যাপার ছিল কি-না অমরনাথই জানেন। তবে, আমার যাওয়াটা মদনবাবুর জন্যই হল। জানি না, বাবা অমরনাথের এ কোন্ লীলা মদনবাবুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এত কাণ্ড অমরনাথে পৌঁছে তা বুঝলাম। সে প্রসঙ্গ যখন আসবে অবিস্মরণীয় সেই ঘটনার বিবরণ তখন দেব।

সহস্রাব্দের ৮ জুলাই অমরনাথ যাত্রা করলাম। দিল্লি পর্যন্ত একেবারে একা। একা থাকার উপায় আছে! মনই মনের সঙ্গী হয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলে অবিরাম। কত কথা বলছি কত কি ভাবছি নিজের মনে। পথ আমাকে ভীষণভাবে টানে। পথে একবার পা দিলেই বন্ধনহীন পথিক আমি। বাড়ির কোনো টানই অনুভব করি না। এমন কি দৈনন্দিন কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পিছন ফিরে তাকাই না কখনও। গৃহিণীর ব্যাকুল দুটি চোখ যে আমার দিকে পড়ে আছে তাও ফিরে দেখিনি কোনোদিন। এই অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য কত অশান্তি হয়েছে। মেয়েমানুষের অভিমান ভাঙাতে স্বয়ং ভগবানকেও রাধার পায়ে ধরতে হয়েছিল। নেশাসক্ত পুরুষের মত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—আর হবে না। এ ভুল আর কক্ষনো করব না জীবনে। কিন্তু আশ্চর্য বাড়ির বাইরে পা দেওয়া মাত্র সব ভুলে যাই। প্রতিশ্রুতির কথা মনে থাকে না। একবারও ভাবি না একজোড়া চোখ আমাকে অনুসরণ করছে। আমার স্বভাবের মধ্যে এ কোন ভোলানাথের বাস? সংসারের ঝোলাঝুলি ফেলে গণ্ডির বাইরে পা রাখলে ঘর আর ঘর থাকে না।

রেলের জানলায় মুখ রেখে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। গাছপালা, মাঠঘাট সব দ্রুত সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কী আকুল আগ্রহে ধরে রাখার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম-ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে অনন্তের অভিমুখে চলেছে।

৯ জুলাই সকাল ১০টা দিল্লি পৌঁছলাম। সেখান থেকে বিকেলের ট্রেনে শালিমার

এক্সপ্রেসে করে যাব জম্মু-কাশ্মীরে। যাইহোক, এখানে এসে একাকীত্ব ঘুচল। সহযাত্রীদের সঙ্গে এক কামরায় জায়গা হল।

১০ জুলাই, সকালবেলা জম্মু স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে মোটরগাড়ি ভাড়া করা হল। জম্মু থেকে শ্রীনগরের পথে যেতে যেতে নানান উচ্চতায় কত পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই উতরাই করতে করতে মোটর গাড়ি ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলে উঠতে লাগল। পাহাড়ের ঘেরাটোপে বন্দী চোখ জোড়া দিগন্তলীন মুক্ত আকাশকে দেখতে না পেয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে। বিস্মিত হয়ে ভাবছি প্রকৃতির একি বিচিত্র খেয়ালীপনা। ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন, এককালে এই স্থানে ছিল এক বিশাল মহাসমুদ্র। হঠাৎ প্রাকৃতিক কারণেই তার রূপ বদলে গেল। চঞ্চল উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা চিরতরে পাষাণে পরিণত হল।

অত যে ছোট বড় পাহাড় শিখর ও কী প্রস্তরীভূত সমুদ্রের ঢেউ? থরে থরে সাজানো শিখরগুলি আকাশের দিকে মুখ করে অনন্তকাল ধরে কার প্রার্থনা করছে যেন। ঝাউ, পাইনের ফাঁক দিয়ে বয়ে আসা বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় ওদের কাতর প্রার্থনা। হে বিধাতা কার অভিশাপে আমাদের এমন দুর্দশা হল? আর তো পারি না। এই বন্ধন থেকে মুক্ত কর আমাদের।

লক্ষ লক্ষ বৎসর কেটে গেল, তবু অনন্তের কোন করুণা হল না। করুণা হলে কোথায় পেতাম প্রকৃতির এমন শান্ত, স্নিগ্ধ ভুবনমোহিনী রূপ? কোথায় পেতাম আত্মসমাহিত যোগীর আত্মময় হওয়ার নিরালা পরিবেশ? তাই সুদুর অতীতকাল থেকে আত্মসন্ধানী মহাযাত্রীরা আত্মভোলা মন নিয়েই এখানে হাজির হয়েছেন সেই পরমকে অনুভব করতে। এ হল শিবের সাধনভূমি। মহেশ্বরের খাসতালুক। সর্বত্র হর-পার্বতীর মহিমা। স্তব্ধ শান্ত, ধ্যানমৌন আনন্দই যেন একটি স্তব, একটি ওঙ্কারধ্বনি—এক অখণ্ড মহাকাব্য, যতদূর দৃষ্টি যায় পাহাড়ের পর পাহাড়। সর্বত্র একটা উদাসীন অধ্যাত্ম শান্তি ছড়ান। কোন চাঞ্চল্য নেই কোথাও। এই ছিল প্রকৃত কাশ্মীরের সত্যিকারের রূপ। আবেশ মাখা চোখে চেয়ে রইলাম।

ভারত পথিকের হৃদয়ের মধ্যে কাশ্মীরের সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, শিব ও সুন্দরের রূপ আঁকা হয়ে আছে চিরতরে। তাই বোধ হয়, কাশ্মীর ভারতের ভূস্বর্গ হয়ে থাকল। দেবভূমি কাশ্মীর হল প্রাচ্যের নন্দনকানন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সভ্যতা বিকাশের পীঠভূমি। বেদে পুরাণে যে ভারতবর্ষকে আমরা পাই তা অখণ্ড হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। কথাটা মনে হওয়া মাত্র কেমন উন্মনা হয়ে যাই। উন্মনা মনটা উধাও হয়ে যায় এক সুদূর অতীতে। উধাও হওয়ার সুখ আলাদা। ক্ষণিকের জন্য হলেও এক

অন্যসুখের স্বাদ পাব বলে তো কলকাতা থেকে বেরিয়েছি। অতএব যে দিকে খুশি মন চলুক নিজের মত।

এই আমি দাঁড়িয়ে দেখছি সেই আমিকে। তার এক পা অতীতে আর এক পা বর্তমানে। যে পথ অতীতে সে পথ চলেছে ভারতের আদি সভ্যতার পথের চিহ্ন ধরে। অনাদি অনন্তের ঐতিহ্যবাহী সেই আমি পৌরাণিক ভারত পর্যটনে বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু যে আমি বর্তমানে, কাশ্মীরের কাছে হাত পাতলে সে কিবা পেতে পারে? রাইফেল, মেশিনগান, এ-কে-৪৭, মর্টার, লঞ্চার হাতে নিয়ে ছুটে আসছে ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য পাকিস্তান। পরনে তাদের ইসলামের উর্দি, কণ্ঠে শোণিত পিপাসার জেহাদ। মৃত্যুর ঝড় তুলে ধেয়ে আসছে তারা।

মধ্যযুগের ইতিহাসেও দেখি কাশ্মীরের রক্তে রাঙানো মাটির ওপর দিয়ে পৈশাচিক উল্লাস করতে করতে বিশ্বত্রাস চেঙ্গিস খাঁ প্রবেশ করল। মৃত্যুর ঝড় তুলে সদর্পে বলল; আমি চাই জয়। আমি মৃত্যু। আমি মহাত্রাস। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব করি ছারখার! মহাশ্মশানের ওপর দাঁড়িয়ে সব হারানোর দুঃখে কাশ্মীরের মানুষ যখন অসহায়ের মত হাউ হাউ করে কাঁদবে, অট্টহাস্য করতে করতে আমি সেই দৃশ্য দেখব। উপভোগ করব। নারীকে ধর্ষণ করব। পাশব উল্লাসে মজা করার জন্য সন্তানের সামনে মাকে, মায়ের সামনে মেয়েকে বলৎকার করব। আমি এমনই পাষণ্ড, বর্বর। ইতিহাসে অত্যাচারী চেঙ্গিস খাঁর নাম শুনে লোকে ভয়ে আঁৎকে উঠবে, বিভীষিকা দেখবে! পৃথিবীতে চেঙ্গিস খাঁ শুধু একজনই থাকবে। মানুষের কাছে সে দানব, অসুর দৈত্য হয়ে থাকবে।

এর পরেও ইতিহাস থেমে থাকেনি। আঘাতের চিহ্ন মুছে ফেলার আগেই তাতার পাঠান হানাদারদের আঘাতে কাশ্মীর শ্মশানে পরিণত হল। পাঠানেরা কেড়ে নিল অভাগা কাশ্মীরবাসীর শেষ সম্বলটুকু। দস্যুরা অন্যসব কিছুর মত তাদের ধর্মকেও লুঠ করল। বলপূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করল। বিপন্ন জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন দেব-দেবীর মূর্তি, মন্দির। তাও ভেঙে তছনছ করল। যারা নিজের কুলধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হল না রাজরোষে পড়ল তারা। তাদের কাউকে শিরোচ্ছেদ করা হল; কাউকে শূলে চড়ানো হল, কাউকে বন্যজন্তুর খাঁচায় ছেড়ে দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল।

বর্তমানে দাঁড়িয়ে হিন্দু নিধনের অনুরূপ এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি। স্থান : মেঘনা নদীর প্রত্যন্ত অঞ্চল নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর, কোনি। কাল : ১০ই অক্টোবর ১৯৪৬ কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোর দিন। জল্লাদ : গোলাম সারোয়া। সে রাজা ছিল না, কিন্তু রাজ্য শাসনের অধিকার রেখেছিল। মুসলিম লিগ নির্বাচনের টিকিট

দিল না বলে হিন্দু মেরে সামনের সারিতে আসতে চাইল। স্ব সম্প্রদায় ও স্বধর্মের মানুষের পূজো পেতে চেঙ্গিস খাঁর চেয়ে নিষ্ঠুর জল্লাদ হতে তাঁর বাধেনি। একতরফাভাবে হিন্দু হত্যা করল গোলাম সারোয়া। অস্ত্র দিয়ে নৃশংস হত্যা করা শুধু নয়, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল অনেককে। জোর করে মুসলমান করা হল। যারা বাধা দিল তাদের কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারা হল, মেয়েদের বলৎকার করা হল, ঘরে আগুন দেওয়া হল। জীবন্ত কবর দিতেও তারা দ্বিধা করেনি। চেঙ্গিস খাঁরা চিরদিনই আছে। বীভৎসতার যে চিরচিহ্ন রেখে গেছে তার স্মৃতিগুলি আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। দুঃসহ ক্লান্তিতে আমার মন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। বর্তমানের এই ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত কাশ্মীরকে দেখার মন নেই আমার।

আমার মন রহস্যঘন হিমালয়ের বন-বনানী, গিরি-কন্দর পার হয়ে চলে গেছে কাশ্যমার দিকে। প্রাগৈতিহাসিক কালের সেই কশ্যপ মেরুতে। কত মানুষকে একদিন তার টানে টেনে এনেছিল এখানে। এই পথ ধরেই আমি একবার কাশ্যমারকে দেখব। এখানে পা রাখার আগে একবারও ভাবিনি এ পথের কথা। এখানে এসে মনে পড়ল কাশ্মীরই নাকি অমরনাথের দুয়ার। এ দুয়ারে এক পাশ দিয়ে বইছে নীলগঙ্গা; অরণ্য পর্বত ভেদ করে নিচের দিকে নামছে। পড়ি কি মরি করে তরতর করে নামছে তো নামছে। আর তারই পাশ দিয়ে বেশ একটু উচ্চতায় এঁকে বেঁকে উঠে গেছে একটি বিসর্পিল পথ। এই পথ হল শ্রীনগর এবং অমরনাথ যাওয়ার যুগযুগান্তরের পথ। এই ঐতিহাসিক সরণি বেয়ে পাঁচ-ছ হাজার বছর আগে কশ্যপ এসেছিল সপ্তসিন্ধু কাশ্মীরে।

প্রকৃতিরাণী কাশ্যমার দিকে আমি মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছি। ভুবন মনোমোহিনী তুষার কিরীটিণী আত্মসমাহিত দেবাত্মা হিমালয়ের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সুদৃঢ় অতীত আমার নয়নপটে ভেসে উঠল।

পৃথিবী তখনও জাগেনি। মানব সভ্যতা ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। বিজন পার্বত্যপ্রদেশে বসুন্ধরা শুধু একা। সহস্রধারা ঝরনার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে শুধু নিজেকে দেখে। নিজেকে নিয়েই মগ্ন। অতল নিস্তব্ধতার মধ্যে শান্ত, নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। অফুরন্ত রূপ, শোভা, সৌন্দর্যের দিকে বিমোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন। স্ফটিক স্বচ্ছ জলে সে রূপ ভাঙছে। নতুন নতুন ঋতুতে নিজেকে ভেঙে ভেঙে আবার নতুন সাজে সেজে উঠছে। বিতস্তা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ফেনার নূপুর পরে এলোকেশ বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে নৃত্য করছে। অরণ্য ও লতাকুঞ্জের শাখায় শাখায় গায়ক

পাখিরা সুমধুর স্বরে তাকে গান শোনাচ্ছে। তার সঙ্গে দেয়ালা করছে, বাতাস ব্যজন করছে। নীল আকাশ মাথার ওপর ছত্র ধরেছে। প্রকৃতি রাণী হয়ে বসে আছেন বসুন্ধরা। তবু সুখ নেই মনে। কী যেন নেই তার। এই অভাববোধে প্রাণটা হায় হায় করে। এত ফুল-ফল, বিপুল ব্যাপ্ত আকাশ-নদী-প্রান্তর-কান্তারের মধ্যে থেকেও এত একা লাগে কেন? এসব তাহলে কার জন্য সৃষ্টি? কার প্রতীক্ষায় আছে সে? কোথায় তার বাস? তবু বুকের গভীরে কার পদধ্বনি হয় যেন? কিন্তু তার প্রকাশ কোথায়? যত দিন যায় ব্যাকুলতা বাড়তে লাগল বসুন্ধরার। অবকাশ অনন্ত বলেই এত আকুলতা!

ব্যাকুল হওয়ারও একটা ভাষা আছে। সেটা নিগূঢ় বলেই দুর্বোধ্য। অনন্তকাল ধরে মৌন থাকতে থাকতেই নীরবতাও বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে। বুকের কলধ্বনিতে, শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বসুন্ধরা তাকে টের পায়। ওই আত্মস্থিত যোগাসীন বিরাট তুষার শৈলাধারের মধ্যেই সেই অজয়, অব্যয় অমেয়ের প্রকাশ। উনিই হলেন সেই দেবতা যিনি তাকে বুকে ধারণ করে আছেন। উনিই পালন করেছেন তাকে। উনিই তার রক্ষাকর্তা। সুতরাং তার সব প্রার্থনা ওঁর কাছে করা উচিত।

ধ্যানস্থ আত্মসমাহিত দেবতার নিদ্রাভঙ্গের জন্য একদিন বসুন্ধরা আকুল হয়ে তাকে ডাকল। ওগো দেবাদিদেব, আর কতকাল তুমি ধ্যানস্থ থাকবে? এবার চোখ খোল। চেয়ে দেখ, তোমার বসুন্ধরা কী অপরূপ সাজে সেজেছে। কিন্তু এসব সাজসজ্জা কার জন্য? আমার এই রূপ দেখবার আছে কে? তবু ঋতু ঋতুতে সাজ পাল্টাই—সে কার জন্য? আত্মসমাহিত হয়ে থাকার জন্য তুমি জান না একাকীত্বের কষ্ট কী ভয়ঙ্কর? আর কতকাল একাকীত্বের যন্ত্রণা সহ্য করব? একাকীত্বের বোঝা তো আর টানতে পারছি না। এতবড় মহাশ্মশানে আমি কাকে নিয়ে থাকব? তুমি প্রকাশ কর নিজেকে! এমন মৌন হয়ে থাকতে কারও ভাল লাগে? তুমিও কি আনন্দ পাও? তা হলে নিজেকে অভিব্যক্ত করছ না কেন?

শূন্যলোক থেকে বাতাসের স্বরে কে যেন বলল : চাঁদবদনী তোমার দুঃখটা আমি বুঝি। কিন্তু সর্বশেষ যে প্রাণী মানবাকারে প্রকাশিত হবে সে তোমার রূপের স্তুতি, সৌন্দর্যের বন্দনা করতে পারবে। তোমার প্রকাশ তার মধ্যে দিয়ে নবনব রূপে অভিব্যক্ত হবে।

বসুন্ধরা বলল : তা-হলে সেই মানব সন্তানকে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। হে দেব, তুমি প্রসন্ন হও। তার ভাবনা-চিন্তায়, অনুভব-উপলব্ধিতে আমি, তুমি স্বরাট হয়ে থাকব; একী কম আনন্দ!

অন্তরীক্ষ থেকে ভেসে এল সেই কণ্ঠস্বর। পুত্রী, ঐ সন্তানের হাতে থাকবে ভাঙা-গড়ার শক্তি, মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা। তার প্রকাশে পৃথিবীর লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে বেশি। নবনব দুঃখ ডেকে আনবে শুধু। তোমার সব শান্তি নষ্ট হবে। এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হবে। তোমার সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হবে। নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে, এখন শুধু একাকীত্বের শূন্যতার জন্য যে প্রাণটা হায় হায় করছে সেদিন সেই প্রাণটা উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে যায় যায় করবে। সেদিনও এমনি করে আমার কাছে কেঁদে এসে পড়বে। বলবে, হে দেব বাঁচাও। তোমার সৃষ্টিকে বাঁচাও। দানবের অবিচারে অত্যাচারে, আসুরিক অনাচারে-ব্যভিচারে, দৈত্যের ভৈরব নৃত্যে, মানবিক অসম্মানে, অমর্যাদায় পৃথিবী নরকে পরিণত হয়েছে। তুমি ছাড়া আর কে আছে তাকে রক্ষা করার?

বসুন্ধরা বলল : মিছেমিছি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। আমার ভুবনে হিংস্র প্রাণীর রেষারেষি থেকে তো বেশি কিছু নয় সে। এসব নিয়ে যদি শান্তিতে, সুখে নির্বিকারভাবে দিনযাপন করতে পারি, স্বপ্ন দেখতে পারি, তা-হলে মানবের প্রকাশেও তা পারব।

অন্তরীক্ষে পরমপুরুষ হেসে উঠলেন—খুশি ও বিষাদের মাঝামাঝি এক ধরনের হাসি। বললেন উত্তম, তোমার প্রতীক্ষার অবসান হবে শীঘ্রই। তুমি আর একা থাকবে না।

হলোও তাই। বেশ কতকগুলো বর্ষা ঋতু পার করে এক দুরন্ত প্লাবনে ভাসতে ভাসতে বহু উত্তাল পাহাড়ী নদী অতিক্রম করে, গভীর জঙ্গল পেরিয়ে বন্য-জীবজন্তুর হিংস্র আক্রমণ প্রতিহত করে সারা পাহাড় ডিঙিয়ে অন্য এক দুনিয়া থেকে কশ্যপ চরণ রাখল সপ্তসিন্ধুর পাড়ে।

আকাশের গায়ে তখনও আঁধার বিলীন হয়ে যায়নি। অরুণ আলোর আভা পড়েছে চারদিকে। নবারুণ সবিতারূপে পর্বতমালার মাথায় তখনও জেগে ওঠেনি। আকাশ, অরণ্যের বক্ষলীন হয়ে তখনও ঘুমের ঘোরে পর্বতমালা। দেখতে দেখতে চটুল মেঘের ফাঁকে উঁকি দিল উষার আরক্তিম আলো। দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হল। ধ্যান সমাহিত হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গের শিখরে শিখরে সূর্যের আলো দীপমালা রচনা করল। অমনি এক বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হল। নরম, স্নিগ্ধ, মিষ্টি, রক্তাভ আভায় যেন কিসের মায়াজাল ছড়িয়ে পড়ছিল। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে ছিল কশ্যপ। বুকের মধ্যে তার কত রকম ভাবের বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মনটা পাহাড়ী মেঘের মত ডুবছে, ভাসছে, দুলছে। ফুরফুর করে অজস্র তুষার শেফালী ফুলের মত ঝরে ঝরে

পড়ছে আকাশ থেকে। কশ্যপের গায়েও পড়ছিল। আর এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। তার অন্তরের মধ্যে কত বর্ণময়, ধ্বনিময় সুর বেজে উঠল। ভাবনার গভীরে ডুবে গেল কশ্যপ। একাত্মতার নিবিড় বন্ধনে পরমাত্মীয় হয়ে উঠল এই পর্বতমালা এবং সূর্যালোকিত বসুন্ধরা। কশ্যপের মনে হল ঐ সবিতা, ঐ তপন, ঐ ধ্যান-সমাহিত প্রকৃতিলোকের তো সন্তান সে। ওঁরাই তার পিতা-মাতা। নিরাশ্রয় সন্তান যদি ওঁর কাছে আশ্রয়ের দাবি করে তাহলে নিশ্চয়ই দেবেন তিনি। সমস্ত প্রাণীকুলকে তিনি তো তাঁর অরণ্যে আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের নিয়মিত আহার যোগাচ্ছেন। কশ্যপ তো তাদের থেকে আলাদা নয়। তার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কোন গুহা হয়ত তাকে ডেকে নেওয়ার অপেক্ষায় আছে। নইলে, এমন প্রকৃতিময় পরিবেশে তাকে আনবেন কেন? আশ্বাসে, বিশ্বাসে বুকখানা ভরে উঠল। করজোড় করে সবিতাকে প্রণাম করল কশ্যপ। তারপর এগিয়ে চলল। যে জায়গায় সে বসবাস শুরু করল তার নামানুসারে সে স্থানের নাম হল কশ্যপভূমি বা কাশ্যমার। যা কালক্রমে কাশ্মীর নামে রূপান্তরিত হল। কশ্যপ এখানেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখের নীড় বাঁধল। পাঁচ-সাত হাজার বছরের আগের গল্প, এখন কিংবদন্তি। তবু তার মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর সত্য লুকানো আছে।

কশ্যপ এবং তার তিন স্ত্রী দিতি, অদিতি ও কদ্রুকে নিয়ে সংসার ভরে উঠল। খাদ্য চাই, বাসস্থান চাই অতএব থেমে থাকা হল না তাদের। নতুন ভূমির খোঁজে অদিতির পুত্রেরা আগেই বেরিয়ে পড়ল। ক্রমাগত এগিয়ে চলল সামনে। নতুন জনপদ, নতুন সমাজ গড়তেই এগিয়ে গেল তারা। কেবল কদ্রুর পুত্রেরা রয়ে গেল সেখানে। এমনি করে কশ্যপের বংশধরেরা ছড়িয়ে পড়ল কশ্যপভূমিতে। কালক্রমে গোটা আর্যাবর্ত হয়ে উঠল তাদের সাম্রাজ্য। সে হল অনেক পরের কথা।

কুটীর নির্মাণ করে কশ্যপ যেখানে প্রথম বাস শুরু করল সেখানে ছিল এক বিশাল হ্রদ। পান্নার মত সবুজ জল টলটল করত সেখানে। এর পৌরাণিক নাম হল সতীসায়র। বর্তমানে ডাল লেক নামে প্রসিদ্ধ। হরপ্রিয়া সতী, স্বামীর সঙ্গে কখনও বা সখীদের সঙ্গে কৈলাশ থেকে এখানে রোজ জলবিহার করতে আসেন। হর-পার্বতী প্রেম নিবেদনের কত অবিস্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী এই সরোবর। কশ্যপের আগমনে স্থানটির গোপনীয়তা রইল না। পূর্বের মত নিথর নীরবতাও থাকল না। যে স্থান ছিল দেবীর একার এবং একান্ত গোপনীয় যেখানে তৃতীয় কোনে প্রাণীর প্রবেশাধিকার ছিল না; সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটল কশ্যপের। দেবী তখন এই শান্ত নির্জন অরণ্যকে ত্যাগ করে আরও উত্তরে কৈলাশ সরোবরের দিকে সরে গেলেন। এই জায়গাটি

সতীসায়রের চেয়ে আরও মনোরম, দুর্গম, নির্জন এবং চিত্তাকর্ষক। মেঘ আর তুষারে একাকার জায়গাটা মানস সরোবর নামে খ্যাত।

কশ্যপের পায়ের ছাপ পড়া স্নিগ্ধ সবুজশ্যামল দেশে দৈত্যের উৎপাত শুরু হল। কশ্যপের বংশধর কদ্রুর নাগ পুত্ররা সতীসায়রের আশপাশে তাদের রাজ্যপাট তৈরি করে বাস করছিল। অন্যেরা কশ্যপভূমি ছেড়ে অন্য দিকে এগিয়ে গেল। নতুন জায়গায় যজ্ঞকুণ্ড জ্বেলে সমাজ গড়ল। আশ্রম তৈরি করল। গোত্র ও বংশের প্রতিষ্ঠা করল। তারপর দিনে দিনে সে বংশ বিস্তৃত হল। বংশের এক এক ধারা এক একদিকে। জঙ্গল কেটে জনপদ তৈরি হল। নগরের উদ্ভব হল। একজন শাসকের দরকার হল। লেখা হল নতুন শাস্ত্র, বেদ। লিপিবদ্ধ হল নতুন নতুন উপলব্ধি ও দর্শন। কিন্তু তাতেও মানুষের ভেতরে লুকোনো দানবটাকে দমিয়ে রাখা গেল না। সে এল ভাল-মন্দের রন্ধ্রপথ ধরে। মানুষ থেকে দৈত্য-দানব-অসুরের উদ্ভব হল। ধর্মহীনতা কর্তব্যভ্রষ্টের পাপে, দায়-দায়িত্ব জ্ঞানের অভাবে, অকর্ম-কুকর্ম করার অপরাধে আর্য নামক সম্ভ্রমবোধ শব্দটি মুছে গিয়ে দস্যু দানব, দৈত্য, অসুর নামে অভিহিত হল তারা। কশ্যপের নাগ পুত্রেরা সতীসায়রে রয়ে গেল। এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে আগ্রহী হল না তারা। হঠাৎ সেখানে সংগ্রাহাসুরের পুত্র জলোদ্ভবের আবির্ভাব হল। প্রবল পরাক্রান্ত এবং বলশালী জলোদ্ভব ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে তার বরে অমর হয়ে গেল। নিজের আধিপত্য খাটাতে এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের অভিলাষে কশ্যপের নাগপুত্রদের হঠিয়ে দিয়ে ঐ অঞ্চল তারা করায়ত্ত করতে চাইল। সংঘর্ষ লেগে রইল। বিপন্ন নাগাধিপতি জননী কদ্রুর শরণাপন্ন হল। তাদের অসহায়তার কথা শুনে কদ্রু বিপন্ন পুত্রদের রক্ষার জন্য কশ্যপকে সব বলল। কশ্যপ অনুসন্ধান করে জানল ব্রহ্মার প্রত্যক্ষ মদতে জলোদ্ভব নাগদের এলাকা ছাড়া করতে চাইছে। অথচ কশ্যপ হল ব্রহ্মার মানসপুত্র। তৎসত্ত্বেও জলোদ্ভবের পক্ষ নিয়ে তার সঙ্গে বৈরীতা করলেন তিনি। পিতার এহেন অদ্ভুত আচরণে কশ্যপ রুষ্ট হল তাই পিতার করুণা প্রত্যাশী না হয়ে হেমকূট পাহাড়ে গিয়ে শিব শিবানীর তপস্যা শুরু করল।—দীর্ঘকাল ধরে চলা তপস্যায় শিব তুষ্ট হয়ে তার প্রার্থনা পূরণ করল। ভক্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে কৈলাস থেকেই জলোদ্ভবকে লক্ষ্য করে ত্রিশূল নিক্ষেপ করল। কালান্তক সেই ত্রিশূলকে লক্ষ্যচ্যুত করার জন্য জলোদ্ভব সতীসায়রে জলে ডুব দিল। শিবের ত্রিশূল সজোরে সতীশায়রের তলদেশ বিদ্ধ করল। অমনি সতীসায়রের তলদেশ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। নিমেষে সব জল সরে গেল। বিশাল ভূভাগ বেরিয়ে পড়ল।

জলোদ্ভবের আত্মগোপনের জায়গা রইল না। জলোদ্ভব পালানোর চেষ্টা করলে শিবানী একটি পর্বত তুলে নিয়ে জলোদ্ভবের মস্তক লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল। দৈত্যরাজ জলোদ্ভব পর্বতের তলায় চাপা পড়ে নিহত হল।

আসলে এসবই প্রতীক। প্রতীক ভাঙলে অন্য এক বাস্তব গল্প বেরিয়ে পড়ে। তুষারগলা জল এবং বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। কশ্যপ বহু কালের পরিশ্রমে পাহাড় কেটে সেই জলরাশিকে নিম্নের দিকে প্রবাহিত করে দেয়। মানুষ বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য পাহাড় থেকে মাটি ও পাথর ফেলে জায়গাটি ভরাট করে উঁচু করা হয়। এহল তারই গল্প। অথবা কশ্যপের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভূমির প্রয়োজন হল। বসতি সম্প্রসারিত হল। যারা উপত্যকায় বসবাস করছিল জলের অভাব চাষবাস করতে পারছিল না। সেজন্য পাহাড় (বর্তমান বারামুলা নামে অভিহিত।) কেটে উপত্যকায় জল নিয়ে এল। গোটা উপত্যকা সুজলা সুফলা হয়ে উঠল। আসলে এ হল মানব সভ্যতা বিস্তারের আদিপর্বের কাহিনী। সংগ্রহাসুর, জলোদ্ভব, ত্রিশূল শিবানী কর্তৃক পর্বত নিক্ষেপ এবং জলোদ্ভবের সমাধি সবই এক একটি প্রতীক।

অনেক বাঁক ঘুরে উপত্যকা পেরিয়ে আঁকাবাঁকা চড়াই-উতরাই পথ ধরে সর্পিল গতিতে মোটর গাড়ি উপরে উঠতে লাগল। জম্মু থেকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছি। পথের দু'ধারেই পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সারি সারি দেবদারু, ঝাউ, পাহাড় ফুঁড়ে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। এপাশে ওপাশে বেণীর মতই পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে সুন্দরী ঝরনায় জলধারা। ঝমঝম করে ধারাপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পর্বতমালায় মাটির ভাগ বেশি বলে চাষ ভাল হয়। তাই সর্বত্র সবুজের সমারোহ। কোথাও কোন রুক্ষতা নেই। শুধু চেয়ে থাকা সবুজ শ্যামলের দিকে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ঘননীলের আভা, আর চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। চোখ ভরে দেখে নাও। আর অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাক ধূসর রঙের উদ্দাম নীলগঙ্গার দিকে। মুখর জীবনের কত আবেগ আর উল্লাস সেখানে। একটুও থেমে নেই সে। কোন বিশ্রাম চায় না। সময় প্রবাহের সঙ্গে অবিরাম ছুটে চলেছে। শুধু ছুটছে আর ছুটছে। কোন দিকে যে ছুটছে, কেন ছুটছে—সেকথাও জানে না। মনের ভেতর কত কথা জাগে। একটি কথা রূপ পেতে না পেতে না পেতে মন আরেকটি কথায় ঝাঁপ দেয় শব্দের দরিয়ায়। সময় বয়ে যায়। নীলগঙ্গার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন ঢেউ কত আগে যাবে তার এক নিরন্তর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত সে। তাই উন্মাদের মত ছুটছে সময়কে তাড়া করে। অদ্ভুত এক অনুভূতি হল।

আমার চোখ জোড়া ছিল বাইরে, আর মনটি পুরাণের পাতা উল্টিয়ে গল্প খুঁজছিল। কাশ্মীরের পথে পথে কত গল্প আর কিংবদন্তি। সবই শিব শিবানীকে জড়িয়ে। কাশ্মীর হল হরপার্বতীর দেশ। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি সূচনা এই পাহাড়ভূমি থেকেই। বলতে কি ভারতীয় পুরাণের পাতায় কশ্যপই ভারতের প্রথম মানব। আমরা তারই বংশধর। কশ্যপের সন্তানেরা দ্যুলোক ছেড়ে ভূলোকে এল। সপ্তসিন্ধু তীরে এসে দাঁড়াল আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। সিন্ধু নদীর তীরে যারা এল তারা যদি সিন্ধু নামে পরিচিত হত তাহলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু লোকের ভুল উচ্চারণে আর ভাষাগত বিভ্রাটে সিন্ধু শব্দটি হিন্দু হয়ে গেল। আর্যরা সিন্ধু নদীর উপকূলে বসবাস করত বলেই সিন্ধুর বদলে হিন্দু, ইন্দু, ইন্ডাস, ইন্ডিয়া বলে পরিচিত হল। তবু এই ভারতকে হিন্দুস্থানই বলা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের সব কালচারকে হিন্দু কালচার বলে অভিহিত করা হল। এই হিন্দু শব্দটি কোন ধর্মের নাম নয়। তবু হিন্দু নামই ভারতবাসীর নিজস্ব একটি ধর্মমত বলে আবহমানকাল ধরে মান্য হয়ে আসছে।

হিন্দু কোন ধর্ম নয়। এক বিশেষ উপলব্ধি। মাটি, মানুষ, প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, নদী প্রান্তর, ঝরনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে সেই উপলব্ধি। ওই হিন্দু শব্দের একাত্মতার নিবিড় বন্ধনে সারা ভারতের মানুষ বাঁধা পড়েছে। পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে। এই হিন্দু শব্দটি ধরে রেখেছে আবহমান কালের ভারতের ঐক্য, সংহতি ও সংস্কৃতিকে। অন্তরের মধ্যে তার মিলনের সুর বাজে বলে হিন্দুরা বিশ্বের সব জাতি, ধর্ম ও ভাষাভাষীর মানুষকে ঠাঁই দিয়েছে এবং সকলকে গ্রহণ করেছে। আর এই হিমালয়েই ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মভূমি। ভারতের দর্শন ও যোগ, ভারতের প্রসন্ন শান্তি ও ত্যাগধর্ম সেও এই হিমালয়ের কাছ থেকে পাওয়া।

শ্রীনগর এখনও অনেক দূরে। অনেক পথ পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকা ছাড়িয়ে তবে শ্রীনগর। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার সমস্ত মনটা ঐ যাত্রার ছন্দে বাঁধা পড়েছে। এর মাটি, মানুষ, আকাশ, বাতাস, পাহাড়-প্রান্তর, নদী-উপত্যকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি। তাই এক সুদূর অতীত আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমার ভেতরটা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। এক সুদূর ভারতবর্ষ আমার চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। বর্তমানে সে কোথাও নেই। আছে কেবল আমার ভাবনায়। আর কিছু অঞ্চলের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে : হরমুখ, হরমহেশ, হরিপর্বত, শঙ্করাচার্য, ভৈরবঘাট, অমরনাথ, অনন্তনাগ, শেষনাগ, আগুনাগ-পৌরাণিক নামগুলো। এর কারণ সংস্কৃতি সভ্যতা ও ঐতিহ্যে কাশ্মীর হল আগাগোড়া হিন্দু ও আর্যদের। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই ঐতিহাসিক সত্যকে অমর করে রাখার জন্য আর্যরা কোন মিনার গড়ে

যায়নি। কিংবা টেন কমেন্টমেন্টসের মত পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে কিছু লিখে রাখেনি উত্তরপুরুষকে প্রমাণ দেওয়ার জন্য। অথবা, তার কাছে অবশ্য পালনীয় কোনো নির্দেশও রেখে যায়নি। কারণ, ভারতের অন্তর্মুখী মন ভূমিকে ছেড়ে ভূমার সাধনা করেছে। 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।' ভূমা হল সেই পরমানন্দময় পরমাত্মা। 'অল্প' এই সংসার বিষয়ের অল্পতা। ভূমা আর অল্প বোঝাতে যেখানে ব্রহ্মা ব্যতীত আর কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না—সেই ভূমা; আর যেখানে অন্য দেখে, অন্য শোনে, অন্য জানে-তাই অল্প! ভূমা তাই অমৃত। মৃত্যু বা ক্ষয় নেই তার। আর যা অল্প তা ক্ষয়িষ্ণু এবং মৃত্যুশীল। এই পরম সত্যে উদ্ভাসিত হল বেদ উপনিষদ ভারতীয় দর্শন। অধ্যাত্ম বিশ্বাস।

ভারতের ইতিহাস বলতে সর্বাগ্রে পাই পারমার্থিক ইতিহাস। আর অন্য ইতিহাস আছে পুরাণের পাতায়—লৌকিক, অতিলৌকিক কাহিনীর আধারে। সবক্ষেত্রেই হিমালয়ের গহন রহস্যলোক থেকে উঠে এল ভারতের মর্মবাণী। তার ধর্মবাণী এবং কর্মবাণী। ভারতের সবই এই 'ত্রি'কে নিয়ে। বেদ তিনটি। শক্তি তিনটি— তিনে মিলে প্রণব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এছাড়া ত্রিলোক, ত্রিনেত্র, ত্রিফল, ত্রিশূল, ত্রিবর্ণ, সবই তো তিন। ভারতের ইতিহাস তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাচাই করতে হয়। বেদ, পুরাণ আর বাস্তব ইতিহাস। কাশ্মীর থেকে এই তিনের যাত্রা। হিমালয়ের গহনলোক থেকে উঠে আসা এক মহাজীবন : তথাগতকে জীবন কি, মৃত্যু কি, ঈশ্বর কি, এই তিন প্রশ্নে অস্থির করেছিল। নিজেকে জিগ্যেস করে জান এই হল ভারতের অধ্যাত্ম শিক্ষার ইতিহাস। উপনিষদের পাতায় পাতায় এই জিজ্ঞাসা-আত্মা, অমরত্ব ও ঈশ্বর। ঐতিহাসিক ভারত আজও সুস্থির এবং শান্ত হয়নি। পার্থিব কামনা, পারমার্থিক জীবনতৃষ্ণা নিয়ে চির অতৃপ্তির মাঝে সে মহামৌন।

এই নির্বিকারত্বের রন্ধ্রপথ ধরে বিদেশী হানাদার সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের মাটিতে তাদের চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। আর তার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অনেক কিছু হারাতে হয়েছে তাকে। অসহায়ের মত মেনে নেওয়ার জন্য অন্য সভ্যতার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তাই, এক শ্রেণীর আত্মসন্তুষ্ট স্তাবকেরা বলেন, ভারত কিছু হারায়নি। দিবে আর নিবের নীতিকে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিও কৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বিশালতা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেছেন। তাই যদি সত্য হয় তাহলে অনৈক্য নিয়ে এত বিবাদ, বিভেদ কেন? এত রক্তক্ষয়ী হানাহানি কেন? ঐক্য ও সংহতি বাস্তবে কোথাও নেই। মনগড়া একটা ধারণার ইউটোপিয়া সৃষ্টি করে কল্পনাবিলাসী

গুণিজনেরা প্রকৃতপক্ষে সুপ্রাচীন ভারতীয় কালচার যা হিন্দু মননের ওপর গড়ে উঠেছে তার সম্পর্কে প্রশস্তিমূলক সার্টিফিকেট দিয়ে ভারতবর্ষকে মহান করে দেখিয়েছেন। ভারত ঐ স্তুতিতে ভুলে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে। এর ফল ভাল হয় না। হচ্ছেও না। কাশ্মীরে যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম ও বিকাশ সেখান থেকেই এই সংকটের সূত্রপাত। গোটা ভারতবর্ষে আজ তার অশুভ প্রভাব পড়েছে। অশান্ত, অস্থির ভারতভূমিতে ভারতীয়-সংহতির সংহার যজ্ঞে মেতেছে ভারতসন্তান পাকিস্তানিরা এবং তাদের সৃষ্ট হানাদার বাহিনীর শত শত লোকজন। যে কাশ্মীর ছিল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ব্যবচ্ছেদ করে তাকে ভারতের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক চতুর রাজনীতির খেলা অর্ধশতাব্দী ধরে চলেছে। কাশ্মীর ভ্রমণকালে তার অপচ্ছায়া সব ভ্রমণার্থীদের মনকে দুর্ভাবনায় ভারাক্রান্ত করে রাখে। নিজদেশে পরবাসী হয়ে সর্বদা একটা আতঙ্ক ও আশঙ্কা নিয়ে বিপন্নভাবে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে কোনো আনন্দ ছিল না। এভাবে সেখানে থাকা যে কী বিড়ম্বনাকর এবং অপমানজনক তা শুধু ভুক্তভোগীরা জানেন। বেড়াতে এসে কাশ্মীরের সেই ইতিহাস লিখতে আমি বসিনি। লিখতে পারলে ভাল হত।

বানিহাল নেহরু ট্যানেলে এসে আমাদের মোটর গাড়িটা অন্য গাড়ির সঙ্গে গাড়ির কিউতে দাঁড়াল। এটাই জম্মুর শেষ সীমানা। এই টানেলটা জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে নো-ম্যানস্ ল্যান্ডের মত দাঁড়িয়ে আছে। ওপ্রান্ত থেকে গাড়িগুলো একে একে এপ্রান্তে পৌঁছনোর পরে এ পারের গাড়ি টানেলে ঢোকার ছাড়পত্র পাবে। ততক্ষণ বিশ্রাম। কাজেই গাড়ি থেকে সকলেই নামল। হাত-পা টানটান করে আড়ষ্টভাবটা কাটাল। খোলা আকাশের নিচে, মৃদু ঠাণ্ডায় শরীরটা একটুতেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

এই টানেল তৈরি হওয়ার আগে ন'হাজার ফুট উঁচু গিরিবর্ত্ম পার হয়ে কাশ্মীরে যেতে হত। এখন কাশ্মীরের পথ সুগম হয়েছে। দূরত্বও কমেছে। বলা বাহুল্য আমরা কিন্তু এখনও কাশ্মীরে ঢুকিনি। জম্মুর মাটিতেই দাঁড়িয়ে আছি। এই টানেল পার হয়ে ওপারে পৌঁছলেই তবে কাশ্মীর।

এক বিদেশী পর্যটকের সঙ্গে এখানে আলাপ হল। নাম আব্রাহাম ইলিয়াস। ভারতে আসার আগে জেরুজালেম ঘুরে এসেছেন। তিনি এসেছেন যিশুকে খুঁজতে। কথাটা শুনে খুব আশ্চর্য হলাম। লোকটা কি পাগল? ভদ্দরলোক আমাকে অবাক হতে দেখে বললেন; এটা অত্যন্ত পুরনো খবর। তুমি কী রুশিয়ান পর্যটক নিকোলাস নাটোভিসের "দি আন্‌নোন্ লাইফ অব জেসাস ক্রাইস্ট" পড়েছে?

পড়া তো দূরের কথা, নাম পর্যন্ত শুনিনি। সে কথা বললে পাছে তার কাছে ছোট হয়ে যাই, নিজের ফাঁকিটা ধরা পড়ে তাই চুপ করে থাকা যুক্তিসংগত মনে হল। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আব্রাহাম বলল, এত অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভারতের আকর্ষণে তিনিও তো আসতে পারেন আমার মত। সত্য হোক, মিথ্যে হোক এই কিংবদন্তি না থাকলে তাঁর যিশুখ্রিস্ট হওয়ার কার্যকারণ খুঁজে পেতাম না। আমি বললাম : মিঃ আব্রাহাম আমি তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। কৌতুক করেই বললাম : আব্রাহাম, তুমি বোধ হয় আমার অজ্ঞতা নিয়ে মজা করছ?

আব্রাহামকে বেশ একটু বিব্রত হতে দেখলাম। বলল, মোটেই না। যিশুর মত সিদ্ধ যোগীর ভারতে আসাটা কোন অবাস্তব ঘটনা নয়। নটোভিচের বক্তব্য এবং অন্বেষণে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমিও ওঁর সঙ্গে একমত।

কৌতূহলী হয়ে বললাম, এখন তো গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে, হয়তো একঘণ্টা লেগে যাবে। এর মধ্যে তুমি আমাকে যিশুর কাশ্মীরে আসার গল্পটা বল। ওটা আমার জানা নেই।

আচ্ছা। এ জন্য তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমিও তো হিন্দুদের সম্পর্কে কিছু জানি না। যাই হোক, যীশুর জীবনে ষোল বছর অজ্ঞাত আছে। এই সময়টা তিনি কোথায়, কী অবস্থায় কাটিয়েছেন সে কথা কেউ জানে না। জানলেও তা চেপে যাওয়া হয়েছে। সেই চাপা পড়া সত্যটার ওপর নটোভিচ আলো ফেলে এক নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। আশ্চর্যের কথা অজ্ঞাতবাসের পরে ঈশা খ্রিস্ট নামে পরিচিত হল। কখন কীভাবে এই নামকরণ হল কেউ তা জানে না। এর কোন ব্যাখ্যা ভ্যাটিকানের পোপ দিতে পারেননি আজও। কিন্তু প্রমাণ আছে তের বৎসর পূর্বদেশে ছিলেন। সেই পূর্বদেশ হল ভারতবর্ষ।

কথাটা শোনামাত্র আমার শরীর রোমাঞ্চিত হল। বিস্ময়ের ঘোর থাকতে থাকতে আব্রাহাম বললেন : প্রথমেই কাশ্মীরে আসেন, তারপর ভারতের পবিত্র তীর্থভূমি কাশী, পুরী প্রভৃতি ভ্রমণ করেছিলেন। ছয় বৎসর ধরে সংস্কৃত শিখেছিলেন এবং উনত্রিশ বছর বয়সে জন্মভূমিতে ফিরে যান। তখন তাঁর নাম যিশু।

অভিভূত হয়ে বললাম : নটোভিচের এই ধরনের সিদ্ধান্তের সত্যতা কতটুকু? কারণ যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার প্রায় একশত বছর পরে খ্রিস্টের জীবনী লেখা হয়েছিল। তখন কিংবদন্তির গল্প তিনি। মানুষের প্রেমের ঠাকুর।

আব্রাহাম বললেন, ঠিক বলেছেন। নটোভিচের কাছেই আমরা প্রথম জানতে

পারি লাডাকের হিমিস গুম্ফায় যে প্রামাণ্য প্রাচীন পুঁথিটি আছে তাতে পদ্যছন্দে যিশুর প্রসঙ্গ লেখা আছে। দু'হাজার বছরের বেশি কাল পুঁথিটি সংরক্ষিত আছে সেখানে। ষোল বছর অজ্ঞাতবাসের জীবন প্রসঙ্গ ছাড়া এই পুঁথিতে অন্যান্যস্থানে রক্ষিত যিশুর জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে সেগুলি অভিন্ন। শুধু তাই নয়। ঐ মঠের বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের দাবি যিশুর মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরে ঐ জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছিল পালি ভাষায়। কারণ ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত লাডাক অঞ্চলের রাজভাষা ছিল পালি। লাডাক সেকালেও ছিল কাশ্মীরের অঙ্গরাজ্য। কাশ্মীর থেকে লাডাকে যাওয়া তাঁর কাছে অসম্ভব কিছু ছিল না।

বললাম, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না জেরুজালেম থেকে যিশু কাশ্মীরে এলেন কেন?

এটা কোনো প্রশ্নই নয়। সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতার প্রতি সুগভীর আকর্ষণ তাঁর মত যোগীব্যক্তির থাকা খুব স্বাভাবিক। একমাত্র ভারতীয় সাধকরা শত কৃচ্ছ্রসাধন সত্ত্বেও শারীরিক ক্লেশে ক্লিষ্ট হয় না। ভারতীয় যোগের এই অসাধারণ শক্তি ও সহিষ্ণুতা সম্ভবত তাঁর কিশোর চিত্তকে আকৃষ্ট করে ছিল। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের উদারতা, মহত্ত্ব এবং পাপীকে ক্ষমা করার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তা বহির্বিশ্বে কোথাও ছিল না। প্রেমধর্মের অপরাজেয় শক্তিতে গৌরবান্বিত ভারতবর্ষে সেই অধ্যাত্মশিক্ষা ও সাধনা করতেই তিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন। এখানেই ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ দর্শনাদিতে দীক্ষিত হয়ে ভারতীয় ভাবধারাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তিনি জেরুজালেম প্রত্যাবর্তন করেন। এবং সেখানে এই উদার মানবিক ধর্ম প্রচার করার অপরাধে রাজরোষে পতিত হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হন। কিন্তু এখানেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি হয়নি। আপনারাও জানেন, ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে সমাধিস্থ করার পরেও তিনি সমাধি থেকে উঠে এসে শিষ্যদের দেখা দেন।

কিন্তু এটা কী বিশ্বাসযোগ্য। এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঐশী পুরুষরূপে তাঁর মহিমা প্রচার করার জন্য ভক্ত পরিমণ্ডলের সৃষ্টি এই কিংবদন্তি।

আব্রাহাম বলল : আমি কিন্তু তা মনে করি না। ভারতের যোগীদের কাছে তিনি যোগবিদ্যা শিখেছিলেন। ভারতীয় যোগীরা কুম্ভকের দ্বারা মাটির নিচে চার পাঁচ দিন কাটিয়ে জীবিত থাকেন। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় যিশুও সেই যোগবলে দৈহিক যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে গিয়ে আত্মসমাহিত অবস্থায় ছিলেন। ভক্তরা তাঁকে কবর থেকে তুলে এনে তাঁর ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করেন এবং সমাধিভাঙার পরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। তারপর শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে পায়ে হেঁটে কাবুলের ভেতর দিয়ে

কাশ্মীরে পালিয়ে আসেন। হরি পর্বতের কাছে খান ইয়ারীতে যিশুখ্রিস্টের সমাধি মন্দির সেই অতীত ইতিহাসের সাক্ষী। আপনাদের স্বামীজি তো নিজে ঐ পবিত্র সমাধিস্থল দর্শন করেছেন। শুধু তাই নয়, কাবুলের পথে কাশ্মীরে আসার সময় যে পুষ্করিণীতে হাত মুখ ধুয়ে তিনি জলপান করেন তা আজও বর্তমান আছে। প্রত্যাবর্তনের পথে আমিও সেখানে যাব। দু'হাত ভরে সে জল পান করব। আঁজলা আঁজলা করে মুখ চোখে দিয়ে পবিত্র হয়ে উঠব।

অবাক বিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করলাম তাঁর মত নির্ভীক মহাপুরুষ এভাবে আত্মগোপন করে থাকলে তাঁর মহিমা প্রকাশ পায় না। আর তিনিও তা চাইবেন না। কারণ, জগতে যে কাজের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন সেই কাজই অসমাপ্ত থেকে যায় তাঁর।

আব্রাহাম বলল : তিনি তো সাধারণ মানুষের মত হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলেন না। সংগোপন ধর্মপ্রচারের জমি তৈরি করেছিলেন। ভারতবর্ষে যাঁরা তাঁর ভাবধারা গ্রহণ করেন তাঁদের নাথ সম্প্রদায় বলা হয়। এই নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুর নাম ঈশানাথ।

নটোভিচের এই আশ্চর্য বই তাহলে তো পড়তে হয়। বইটির নাম কি? একি বাজারে পাওয়া যায়।

মদনবাবু বললেন : বই-এর নাম আমি জানি। The unknown life of Jesus Christ। মাথা খুঁড়লেও কোথাও পাবেন না। বইটি চেপে দেওয়া হয়েছে। তবে আমার এক বন্ধু বলছিল কলেজ স্ট্রিটে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের কাছে 'নবভারত পাবলিশার্সে' আছে। একখানা চটি বই। একশ টাকা দাম।

সুবীর বলল : আচ্ছা মিঃ আব্রাহাম, অমার মনে একটাই প্রশ্ন জাগছে, জেরুজালেমে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যে মহামানবের মৃত্যু হল, তাঁর জীবনী লেখা হল প্রায় ছ'সাত হাজার কিলোমিটার দূরে পার্বত্যরাজ্যের এক অজ্ঞাত গুম্ফায়। কল্পনারও একটা সীমা থাকা উচিত।

আব্রাহাম বলল : মিঃ তাহলেই বুঝুন তাঁকে চাক্ষুষ না দেখলে, তাঁর সংস্পর্শে না এলে, তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা সে যুগে সম্ভব হত না। তা ছাড়া যিশু তখন বিশ্ববিখ্যাত লোক হননি। যাতায়াতের অসুবিধে, যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থার বাধা অতিক্রম করে সুদূর লাডাক অঞ্চলে তাঁর জীবনবৃত্তান্তকে সংরক্ষিত করে রাখা হল। এ থেকে বোঝা যায় তিনি সেখানে ভীষণভাবে ছিলেন। কাশ্মীরের মধ্যেই তিনি ছিলেন বলেই তাঁর মৃত্যুর তিন-চার বৎসর পরেই ওই জীবন বৃত্তান্ত লেখা সম্ভব

হয়েছিল। তাছাড়া অজ্ঞাতবাসের ষোল বছরের বৃত্তান্ত একমাত্র এখানকার গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

আব্রাহামকে সমর্থন করে বললাম : হ্যাঁ, দু'হাজার বছর পরে তার চাক্ষুষ প্রমাণ খুঁজতে চেষ্টা করা বৃথা। তার থেকে পারিপার্শ্বিক প্রমাণই বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং তার ওপর নির্ভর করে নটোভিচ যেভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন যুক্তির দিক থেকে তাকে মেনে নিতে বাধা কোথায়?

আব্রাহাম বলল : দুহাজার বছর ধরে কাশ্মীরে খানাইয়ারীতে ঈশার (যিশুর আগের নাম) কবর বলে যে পবিত্র স্থানকে সম্মানিত করে আসছে তাকে মিথ্যে বলব কেন? সজ্ঞানে স্থানীয় লোকেরা মিথ্যাচার করবে কেন? এখানে যাঁরা বাসিন্দা তাঁরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী হলে না হয় বিশ্বাস করা যেত যে যিশুর পবিত্র নাম ভাঙিয়ে পয়সা রোজগারের ধান্দা করছে। সুতরাং অবাস্তব বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমি বিজ্ঞের মত বললাম : নটোভিচের এই সিদ্ধান্তকে খ্রীস্টানরা মেনে নেয়নি। এর সত্যতা নিয়ে অনেক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।

আব্রাহাম স্বীকার করল। বলল—বিতর্কের মানে কিন্তু মিথ্যে হওয়া নয়। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম কমিউনিস্ট দেশের লোক নটোভিচ ইংলন্ডের প্রতি রাষ্ট্রনৈতিক বিরুদ্ধাচরণের কারণে এরকম বিভ্রান্তকর উক্তি করেছেন। কিন্তু আপনাদের স্বামীজি, অভেদানন্দজি তো আর মিথ্যে বলেনি। অভেদানন্দ নিজে হিমিশ গুম্ফায় রক্ষিত ঐ বিতর্কিত পুঁথি দেখে এসেছেন ১৯২২ সালে। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম উভয়ের বক্তব্যই অসত্য। তা'হলে গুম্ফায় রক্ষিত ঐ প্রাচীন গ্রন্থটিতে যিশুর যে জীবনকথা আছে যার সঙ্গে ভ্যাটিকানের রক্ষিত গ্রন্থের কোন অমিল নেই। অস্বীকার করতে হলে ষোল বছর অজ্ঞাতবাসের কাহিনী অস্বীকার করতে হয়। এরকম একটা গ্রন্থের কিছুটা মানব, কিছুটা মানব না এরকম খেয়ালখুশি তো চলে না। কাজেই বিতর্কের জন্য বিতর্ক চলতে পারে অনন্তকাল ধরে। কিন্তু তা ধোপে টেকে না। অবতার যিশু যদি তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে ভারতের মাটিকে ধন্য করে থাকেন তাতে দোষ কী? যিশুর মহিমা কিংবা তাঁর গৌরব তো তাতে কমে না। এবং তিনি যে অজ্ঞাতবাসের ষোলটা বছর ভারতে ছিলেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর বাকি জীবনটা ভারতে কাটিয়ে কাশ্মীরে দেহরক্ষা করতেই পারেন। খ্রিস্টানদের মানা না মানায় কি এসে যায়? যা সত্য তা একদিন বেরিয়ে পড়বেই।

আব্রাহাম বলল : মানবিকতার দেশ ভারতবর্ষে সবধর্মের মানুষের সমান

সমাদর। ভারতবর্ষ কাউকে প্রত্যাখ্যান করে না. সকলকে নির্দ্বিধায় স্থান দেয়। একটা থার্ড ওয়ার্ল্ডের কান্ট্রি ঈশ্বরের পুত্র যিশুকে আশ্রয় দিলে ভ্যাটিক্যান যে দুনিয়ার খ্রিস্টানদের কাছে ছোট হয়ে যায়। সত্যটা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই ভ্যাটিকান এই ঘটনাকে গালগল্প বলে উড়িয়ে দেবে চিরকাল।

ঢোঁক গিলে বললাম : যিশু আজ মিথে পরিণত হয়েছে। এই মিথ তাদের মানা না মানার ওপর নির্ভর করে না।

অপেক্ষমান মোটরগাড়িগুলির হর্ন একসঙ্গে বেজে ওঠে বিভিন্ন শব্দে। যাত্রীরা হৈ হৈ করে যে যার গাড়িতে উঠে বসল। মাথার ওপর যে বিশাল পাহাড়ের ভার রয়েছে টানেল দিয়ে যেতে যেতে একবারও তা মনে হল না। বরং বিস্ময় লাগে, কোন ময়দানব তৈরি করল এ সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গপথ কাশ্মীরের সঙ্গে জম্মুকে যুক্ত করেছে। এছাড়া অন্যপথ নেই কাশ্মীরে ঢোকার। আগে যেতে হত পাহাড় ডিঙিয়ে। একালের ময়দানবের কেরামতিতে সেই বাধাটা গেছে। কিছুকাল আগেও যা ছিল মহারাজ কাশ্মীরের নিজস্ব পথ এখন তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার মত আনন্দদায়ক ছিল এই যাত্রা। কারণ মানুষ মাত্রেই অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে। টানেল অতিক্রম করার সময় একধরনের অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ মনকে পুলকিত করে রাখে। যাদের দুঃসাহসে, অধ্যবসায়, পরিশ্রমে এই টানেল তৈরি হয়েছিল তাদের অনেক রহস্য এই টানেল জানে। তার আবিষ্কারেই মনটা রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

আমাদের গাড়ি চলেছে শ্রীনগরের পথে। এদিকটা পাহাড়ের চড়াই উতরাই ততটা নয়। তাই যত এগোচ্ছি প্রসারিত হচ্ছে জ্যোতির্ময় দিগন্ত। মনে হচ্ছে, যত উঁচুতে ওঠা যায় মনটাও তত বড় হয়ে যায়। আকাশের যত বিস্তার হচ্ছে ততই দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে। চিরচেনা বঙ্গভূমির মত সবুজ শ্যামল প্রান্তর দেখা যাচ্ছে। গ্রামের রূপও অভিন্ন। বর্ষার বৃষ্টিস্নাত গাছগুলো শ্যামল শোভায় ঝকঝক করছে। এবার সমতল পথে এগিয়ে চলা। খানিকদূর গিয়ে পথটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। একটি গেছে পহলগাঁওর দিকে, অন্যটি গেছে শ্রীনগরের দিকে। রাস্তার ধারে হতদরিদ্র, লাঞ্ছিত নারী ও শিশুর দল পর্যটকদের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে কিছু পাবার আশায়। আপেলের মত টকটকে গায়ের গোলাপী রঙে বয়সোচিত কমনীয়তা ছিল না। ছিল না কোন লাবণ্য। দারিদ্র্য ওদের লাবণ্য কুরে কুরে খেয়েছে। কিন্তু স্বভাবের কোমলতা একটুও নষ্ট হয়নি।

গাড়ি ছুটছে। ছুটেছে দূর থেকে দূরান্তরে। অপরাহ্ণের মরা রোদে নরম সোনালি আলো গায়ে মেখে আমাদের সাদা রঙের সুমো গাড়িটি কাশ্মীর ট্যুরিস্ট লজের সামনে দাঁড়াল। নামতে, না নামতে হাউজ বোটের মালিক এবং দালালেরা মশার মত ছেঁকে ধরল।

কাশ্মীরের মাটিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আধুনিক মদগর্বিত কাশ্মীরের সেই শান্ত নিরিবিলিভাব কোথাও নেই। মানুষ গিজ গিজ করছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিকে শ্রীনগরের পরিবেশে কোথাও দেখতে পেলাম না। এমন কি শ্রীনগরে পাহাড়ী শ্রীটুকুও চোখে পড়ল না কোথাও। ভারতের আর পাঁচটা ঘিঞ্জি শহরের মত একটি শহর। এই কাশ্মীর দেখে আমার কোনো আবেগ জাগল না। চিত্ত স্পন্দনের কূল ভাসিয়ে শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমার স্বপ্নগুলো এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে গেল কেন? স্বপ্ন গেলে বাঁচার সুখ মরে যায়। দেখার আনন্দও থাকে না।

চারদিক থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। নীড়ের পাখি ফিরছিল নীড়ে; অনেক পাহাড় পেরিয়ে একটা ভয় আতঙ্ক ঠোঁটে করে। রাত মানে ভয়। রাত মানেই নিরাপদ আশ্রয়। আমরাও নিরাপদ আস্তানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। চোখে মুখ আমাদেরও একটা ভয় মাখামাখি ছিল। কাশ্মীরের রাত মানেই ভয়ঙ্কর। এখানকার রাত মানে মিলিট্যান্টদের ভয়ে সিঁটকে থাকা। প্রতিটি প্রহর দুর্ভাবনা, দুঃস্বপ্ন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে রাত কাটাতে হয়। এসব চিন্তায় মন খারাপ হয়ে যায়। মনের বনে ঝড় ওঠে।

কাশ্মীরে এই দুরবস্থার জন্য কে দায়ী? কার ভুলে এরকম হল? প্রশ্নগুলো স্বভাবত কিছুক্ষণ মনকে ছুঁয়ে রইল। এক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দেশের ইতিহাস, রাজনীতি, ভূগোল, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক রোমন্থন চলল। হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ভারতবর্ষের মাটি নিয়ে ইংরেজদের ছিনিমিনি খেলার পরিণতি হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি কাশ্মীর এলাকাটি দশআনা ছয় আনা হারে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রইল। কাশ্মীর সীমানা নিয়ে এই কাটাছেঁড়া ও জোড়াতালি দেওয়াটা একেবারে উদ্দেশ্যবিহীম ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের দুমুখো নীতি ভূমিকা কোথাও গোপন নেই। তারা জানত হিন্দুমনস্ক কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মনটা দ্বিখণ্ডিত করে দিতে পারলেই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে একটা চিরন্তন রাজনৈতিক বিভাজন এদেশের মানুষকে সুখে-শান্তিতে থাকতে দেবে না। মাটি ভাগ হলে মনও ভাগ হয়ে যায়। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ণয়ে কাশ্মীরের গুরুত্ব খুব বেশি। কাশ্মীর অধিকারে থাকা মানে রাশিয়া,

আফগানিস্তান, চিনের এই ত্রি-দেশের ওপর নজর রাখা সহজ হয়। এজন্য কাশ্মীরের ওপর বৃহত্তর শক্তি চতুষ্টয়ের নজর ছিল। তারাও চায়না কাশ্মীর স্বস্তি ও শান্তিতে থাক।

রাজনৈতিক স্বার্থে ছোট্ট ও দুর্বল রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে রাশিয়া বাদে আর সব রাষ্ট্র তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দৃঢ় করেছিল। জিন্না সাহেবের জেদ মেটাতে ভারত দু-টুকরো হল। পাকিস্তান পেয়েও জিন্না খুশি হলেন না। কাশ্মীরও তাঁর চাই। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন মদতে তড়িঘড়ি করে বিনা প্ররোচনায় কাশ্মীরে হানাদার বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে তাকে দখলের চেষ্টা করল। কাশ্মীরের হিন্দু নরপতি পাকিস্তানের আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিপন্ন অসহায় নরপতি মুসলমান অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য ভারতের শরণাগত হয়ে সামরিক হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করল। ত্বরিতগতিতে ভারতের সামরিকশক্তি হানাদারবাহিনীর গতি রুখে দিল। বহু মানুষের প্রাণের বিনিময়ে, বীর সেনানীর আত্মদানে কাশ্মীর বিজয় যখন সম্পন্ন তখন মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের স্বার্থে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সুবিধার্থে কাশ্মীর সংকটকে ইউ. এন. ও তে পাঠিয়ে দেওয়ার এক ন্যক্কারজনক ভূমিকা গ্রহণ করেন। কার্যত, তাঁর এই হস্তক্ষেপের ফলে কাশ্মীর দুটুকরো হল এবং তার ত্রিশঙ্কু অবস্থার এখনও অবসান হল না। এজন্য দায়ী তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু। দুর্ভাগ্যের কথা, দেশের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার চেয়ে তাঁর কাছে বড় হল বড়লাটের সুন্দরী স্ত্রীর প্রেম, তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাঁর অনুনয় রক্ষা করার আবেদন।

কাশ্মীরকে ক্রুশবিদ্ধ করার প্রথম পেরেকটি নিজের হাতে বুকের মধ্যস্থলে গেঁথে দিতে নেহরুর একটুও হাত কাঁপেনি। কিংবা বিবেক পীড়িত হয়নি। কাশ্মীরের সংকট ও সমস্যা নেহরুর ভুলে যে সৃষ্টি হয়েছিল ইতিহাস সে কথা সগৌরবে ঘোষণা করবে। নেহরুর চরিত্র সম্পর্কে তাঁর দুজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তি মৌলানা আজাদ ও গান্ধীজির মন্তব্যটি উদ্ধৃত করলে পাঠকরা নেহরুর দায়িত্বহীনতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। মৌলানা আজাদ লিখেছেন : I think one factor responsible for the change was the personality of Lady Mountbatten. She is not only extremely intelligent but has a most attractive and friendly temperament. গান্ধীজি নেহেরু সম্পর্কে বললেন : He is more English than Indian in his thoughts and make up. He is often more at home with Englishmen than his countrymen. এই কারণে, ইংরেজ এডুইনা মাউন্টব্যাটনকে শিখণ্ডীর মত খাড়া

করে জহরলালকে দিয়ে যা খুশি করে নিয়েছে। একবার নয়, বারবার। ইংরেজের স্বার্থে নেহরুর কাছে বড় হওয়ার জন্য গোটা ভারতবাসীর এই দুর্ভোগ। কাশ্মীরবাসীর অনন্তযন্ত্রণার জন্য ঐ মানুষটি যে সবচেয়ে বেশি দায়ী ইতিহাস সদর্পে তা বলবে। আবার বলছি পাকিস্তান সৃষ্টি হল জিন্নার জেদে, জহরলাল নেহরুর ক্ষমতার লোভে। জওহর শব্দের অর্থ বিষ। ভারতকে সেই বিষ পানে বাধ্য করে নিজে আকণ্ঠ ইন্দ্রিয় সুখে ডুবে গেছেন নেহেরু। তাঁর কাজের প্রতিবাদ করার কেউ ছিল না। কেবল ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলে তাঁকেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হল। এমনই তাঁর নামের মহিমা।

হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক দু'দেশের ভাগাভাগির ফলেই বিষিয়ে উঠেছে। একে অপরকে শত্রু করে আমরা শুধু নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে তুলেছি। দুঃখের কথা একজন মুসলমানও মনে করে না সে ভারতীয়। আরব দুনিয়ার ভাষা ও সংস্কৃতি উত্তরাধিকারিত্ব বহন করে এদেশের মুসলমানরা নিজের দেশের মাটি ও ভাষার সঙ্গে যত দূরত্ব রচনা করেছে, পৃথিবীর কোনো দেশে মুসলমানরা সেরকমভাবে নিজের দেশকে পরের দেশ বলে ভাবে না। একবারও ভাবে না তার ঘর পুড়লে আরব থেকে লোক এসে জল ঢালবে না তাতে। প্রতিবেশী হিন্দুরাই এগিয়ে আসবে। মুসলমানদের অত্যন্ত রক্ষণশীলতা ও অন্ধ ধর্মপ্রীতির সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মসচেতনতা বাড়ানোর জন্য এবং ভারতবর্ষের মুসলমানদের আরব দুনিয়ার মুসলমান করে তোলার এক নেটওয়ার্ক কাজ করছে। তার ফলে, নিজেদের ভারতবাসী মনে করে না তারা। দুর্ভাগ্য, ভোটের লোভে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা ভোগের মেরুকরণে মুসলমান ভোট একটা বড় শক্তি হয়ে কাজ করে বলে তাদের ভারত বিরোধী কার্যকলাপ বেশি মাত্রায় প্রশ্রয় পাচ্ছে। হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে। তাই, পাশাপাশি সমান্তরালভাবে পাল্টা হিন্দু সংগঠন গড়ে উঠছে। এখন ভাষা নয়, দেশ নয়, শুধু ধর্মীয় সংগঠন সবার ওপর বড় হয়ে উঠছে। কাশ্মীরের মাটিতে এই বিষবৃক্ষটি এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের তিক্ততার হলাহল পান করার জন্য ভোলা মহেশ্বর নীলকণ্ঠ হওয়ার জন্য অমরনাথ থেকে ছুটে আসেন না। তিনি আজ অচল বরফে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের ধর্মোন্মাদনার মজা দেখছেন।

প্রথম অবস্থায় কাশ্মীর ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য। পাকিস্তান কিংবা ভারতের অভিভাবকত্ব কাশ্মীরের কাম্য ছিল না। নিজের মতই থাকতে চেয়েছিল। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ হয়েও কাশ্মীর ছিল হিন্দু রাজার রাজত্ব। কাশ্মীরে যা কিছু

সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দুত্বের উত্তরাধিকারী ছিল। রাজ্য ও রাজধানী নাম সহ কাশ্মীরের প্রতিটি ইঞ্চি ভূখণ্ডের সঙ্গে হিন্দু পুরাণকাহিনীর এবং ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত। কোনো দিক দিয়ে এই হিন্দুসংস্কৃতির ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এমন কি মুসলমান অভিযানও পারেনি হিন্দু ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে। মুসলমান আক্রমণে অনেক কিছু ধ্বংস হয়েছে কিন্তু কিংবদন্তি কিংবা পৌরাণিক দেব-দেবীর মহিমা কাশ্মীর বাসীর মনে অক্ষয় আসন রচনা করেছে। হিন্দু মুসলমানের এক মিলিত ইতিহাস তৈরি হয়েছে। হিন্দু মুসলমানের এই সংহতি ও ঐক্য যে আজ কাশ্মীরে বিপন্ন তার মূলে আছে জিন্না। কাশ্মীরকে পাকিস্তান ভুক্তির জন্য জিন্না অনেক জল ঘোলা করেছেন। ঘোলা জল না পারলেন নিজে পান করতে, না দিলেন অন্যকে পান করতে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে কাশ্মীর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। মরে বেঁচে ওঠার জন্য ভারতের শরণাপন্ন হয়েছেন হিন্দুরাজা। হিন্দুদের অমরাবতী কাশ্মীরের ভারতভুক্তি হওয়াটা একটা আকস্মিক ব্যাপার এবং যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ।

সে যাই হোক, কাশ্মীর দখল করার জন্য মুসলিম লিগ, জিন্নাসাহেব এবং ব্রিটিশ এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কাশ্মীর নরপতি হরি সিংও তা জানতেন না। যখন যুদ্ধ একেবারে দরজার গোড়ায়, তখন নড়েচড়ে বসলেন মহারাজ হরি সিং। কার্যত হানাদারদের বকলমে পাকিস্তানই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাশ্মীরের ওপর। আর সেই ঐতিহাসিকক্ষণে নিরুপায় রাজা ভারতভুক্তির চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলেন। আর তখনই ভারতীয় সৈন্য আকাশপথে উড়ে এসে হানাদারদের গতি রুখে দিল। সেটা ছিল ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৭। কিন্তু তবু এই যুদ্ধ করার অনেক সমস্যা ছিল। সামরিক বিমান অবতরণের উপযুক্ত ছিল না শ্রীনগরের বিমানবন্দর। ফলে রাতারাতি সৈন্য সরবারাহ বৃদ্ধি করা, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের মালমশলা সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা ছিল ভারতের পক্ষে এক দুরূহ কাজ। তবু যুদ্ধকালীন জরুরী তৎপরতায় যাই করা হল প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। হানাদারদের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে ভারতীয় বীর জওয়ানরা অপূর্ব দক্ষতায় এক অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াতে ব্যর্থ হল। কাশ্মীরের শ্রীনগর তাদের অধরা রইল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশ হওয়া সত্ত্বেও হানাদারদের আক্রমণকে রুখে দেওয়ার জন্য কাশ্মীর উপত্যকায় সেদিন খুশির ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। কারণ, পাকিস্তান সৈন্যরা অধিকৃত এলাকার মানুষকে নির্দয়ভাবে শুধু হত্যা করেনি, তাদের

সম্পদের সঙ্গে নারীকেও লুণ্ঠন করে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে গরু ছাগলের মত উপভোগের পণ্য করেছিল। ভারতের জওয়ানরা তাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করেছিল বলেই ভারতের বিজয়ে তারা উল্লসিত হয়ে ঘরে ঘরে বিজয়োৎসব করেছিল। মুসলিমদের সেই বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা আনুগত্য আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। এযুগে কাশ্মীরবাসীরা সে দিনের পাকিস্তানী আক্রমণের নৃশংসতা এবং বর্বরতা কথা ভুলে গিয়ে শুধু একই ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্য পাকিস্তানকে তাদের মিত্র মনে করে। আর যাদের আত্মদানে তাদের ঘরের সম্ভ্রম এবং জীবনরক্ষা পেল তাদের সঙ্গে বৈরীতার সম্পর্ক। একেই বলে ইতিহাসের পরিহাস। রাজনৈতিক ট্রাজেডি।

অতীতের এত সব ঘটনাপ্রবাহ কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মন অধিকার করে রইল। বারংবার মনে হতে লাগল হানাদারের হাত থেকে কাশ্মীরকে বাঁচানোর জন্য কাশ্মীরবাসীর কোনো মূল্য দিতে হয়নি। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি, আত্মবলি, রাজনৈতিক জটিলতার সব দায় ভারতকেই পোহাতে হচ্ছে। তবু, কাশ্মীরবাসীর মন পেল না ভারতবাসী। তাদের রুজি-রোজগার যা কিছু সবই ভারতে। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং উন্নয়নের আর্থিক দায় ভারতই বহন করছে। তবু, তাদের মনটা পাকিস্তানের দিকে পড়ে আছে। পাকিস্তান কিছু না করে শুধু এক ধর্ম হওয়ার জন্য তাদের বন্ধু হল। কাশ্মীরের মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ আর স্বার্থপর।

অবশেষে, ডাল লেকের ধারে একটা হাউসবোটে থাকার ব্যবস্থা হল। জলের ওপর ভাসমান একটি বাড়ি। ১২ স্কোয়ার ফুটের একটি ঘর অ্যাটাচড্ বাথ, জল, ইলেকট্রিসিটি, গিজার। ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, ইন্টারকাম, টি.ভি. সব কিছু নিয়ে একটি সাজানো আরামদায়ক বিলাস কক্ষ। জানলা খুলে দিলে লেক। নিস্তরঙ্গ জলের ওপর চারপাশের রাস্তার আলো, হাউস বোটের আলো-আঁধারি ছায়া তির তির করে কাঁপছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাতের আকাশও ডাললেকের জলে নেমে এসেছে দেয়ালা করতে। ভীষণ ভাল লাগছিল। শ্রীনগরের সম্পদ এবং অন্যতম আকর্ষণ হল ডাল লেকের ওপর ভাসমান এই হাউসবোটগুলো। বলা যেতে পারে ডাল লেকের দুপাশে লাগানো, হাউসবোটগুলি নিয়ে একটা বিশাল পল্লী গড়ে উঠেছে। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হাউসবোটগুলি বর্তমানে কাশ্মীরে অগ্নিগর্ভ পরিবেশে একটুও নিরাপদ আশ্রয় নয়। বলতে কি, বিদেশের ভাড়াটে সন্ত্রাসবাদীরা এবং সন্দেহভাজন কাশ্মীরীদের গা ঢাকা দেওয়ার নিরাপদ এক আস্তানা হাউসবোটগুলি। ট্যুরিস্টদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দেয়। সে কারণে হাউসবোটগুলিতে ট্যুরিস্টরা ওঠে না বললেই হয়। না জেনে যারা ওঠে তারা পস্তায়।

সেরকম এক অভিজ্ঞতা হল দিনের দিনই। যে হাউসেবোটে আমরা উঠেছিলাম সেখানে জিনিসপত্তর রেখে একটু ফ্রেস হয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে দলবেঁধে ঘুরতে গেলাম। ফিরতে ফিরতে রাত ৯টা হয়ে গেল। কাশ্মীরে রাত নটা খুব একটা রাত

নয়। ভারতের শেষ প্রান্তে পশ্চিমের এই দেশে জুলাই মাসে ৭-৩০ টার আগে সূর্য অস্ত যায় না। যাই হোক, তালা খুলে দেখি ঘরের মধ্যে কুড়ি-বাইশ বছরের এক জোয়ান বসে আছে। বন্ধ ঘরে এভাবে একজনকে দেখে তো চমকে উঠলাম। ভয়ে বুক টিপ টিপ করছিল। প্রথমে চোর মনে হয়েছিল। কিন্তু লোকটির আচরণে ধরা পড়ে যাওয়ার কোন অস্বস্তি ছিল না। বুঝলাম, হাউসবোটের মালিকেরই কোনো লোক। তার কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তালা খুলেছে এবং বাইরের দিক দিয়ে আবার তা লাগিয়েও দেওয়া হয়েছে।

হাউসবোটের মালিককে ডেকে বলা হল : আমরা ঘরে কেউ নেই, তবু তালা লাগানো সত্ত্বেও এ লোকটা ঘরে ঢুকল কী করে। এভাবে অচেনা লোক ঢোকালে তোমার ব্যবসার বিশ্বস্ততা থাকবে?

লোকটা হাত কচলাতে কচলাতে অপরাধীর মত বলল : কসুর হয়ে গেছে বাবু। এখানে লুকিয়ে না রাখলে ও জানে খতম হয়ে যেত বাবুজি। ও অতিথি আছে। একটু রাত গভীর হলেই চলে যাবে। গোস্তাকি মাফ করবেন।

বিদেশ-বিভুঁইয়ে আছি। আমাদের পাশে দাঁড়ানোর মানুষ নেই। গালি-গালাজ করার সাহস হল না। গোটা রাত পড়ে আছে। তার মধ্যে কত কি হয়ে যেতে পারে। আমারা যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। গোটা কাশ্মীর আজ যুদ্ধক্ষেত্র। অকৃতজ্ঞ সাধারণ মানুষ পাকিস্তানের মদতপুষ্ট হামলাদারদের আশ্রয় দিয়ে, নানাভাবে সাহায্য করে ভারত সরকারকে বিব্রত রাখার এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। মনের রাগ মনে জমিয়ে রেখে সহজ হওয়ার চেষ্টা করলাম।

রাগের পারদ নামলে ছেলেটিকে জিগ্যেস করলাম : তোমার ঘর কোথায়?

বেমালুমভাবে বলল : কার্গিলে। গোলাগুলি চলছে বলে থাকতে দিচ্ছে না সেখানে।

বললাম : লোক সরানোর কাজ তো সরকারি ব্যবস্থাপনার হচ্ছে। এবং প্রত্যেককে পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। তা-হলে তোমাদের ভয়টা কিসের? এভাবে আত্মগোপন করে থাকা তো দরকার নেই। পথে ঘাটে তোমার বয়সের বহু তরুণকে দেখলাম। তাদের তো পালিয়ে থাকার দরকার হচ্ছে না।

হাউসবোটের মালিক বলল : ভিনদেশের লোক তো। এখানকার সব কিছু জানে না। জিজ্ঞাসাবাদ হলে ধরা পড়ে যাবে। পুলিশের মারধরের ভয়েই দিনের আলোয় বেরোয় না। পুলিশ আর মিলিটারীদের অত্যাচারে কাশ্মীরীরা জেরবার হচ্ছে। ভালোর চেয়ে তাদের খারাপ হচ্ছে বেশি।

লোকটার কথা শুনে আশ্চর্য হই। পুলিশ ও মিলিটারিদের সম্পর্কে ট্যুরিস্টদের বিদ্রূপ করার কৌশল নিয়েছে ওরা। ভারত বিদ্বেষ এবং ভারতের দুর্নাম সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে কাশ্মীরীরা তৎপর। মনের রাগ মনে পুষে রেখে অসহায়ের মত বলি : বেশ তো, রাতে কোথায় ঘোরাঘুরি করবে? রাতে চোর-ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাইসরা ছাড়া কোনো ভালো মানুষ বেরোয় না।

ছেলেটি আমার প্রশ্ন না বোঝার ভান করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল : কার্গিলে এখন ভয়ংকর যুদ্ধ চলছে। ভারতীয় জওয়ানরা কীভাবে যে ঠাণ্ডার মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে যুদ্ধ করছে আপনারা ভাবতেও পারবেন না। আরম্ভ করল কার্গিলের গল্প। আর আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার কথাগুলো গিলতে লাগলাম।

স্বদেশপ্রেমে সুড়সুড়ি দিয়ে ছেলেটি মন ঘুরিয়ে দিল শুধু না, ওখানকার গরিব মানুষগুলোও যে এই যুদ্ধের জন্য কী অবর্ণনীয় ত্যাগ স্বীকার করছে তারও গল্প শোনাল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজতেই ছেলেটা চঞ্চল হয়ে উঠল। হঠাৎই গল্পে যতি টেনে দিয়ে বলল : রাত অনেক হয়েছে বাবু। এবার আপনারা খানাপিনা করে নিন। খানা বোধ হয় তৈরি। বলে, হোটেলের মালিকের নামের শেষে একটা চাচা যোগ করে ডাকাল। বলল : বাবুদের নিদ লেগেছে। রাতের খানা দিয়ে দাও।

তারপর সটান উঠে দাঁড়াল। বলল : বাবু, আমাকেও এবার উঠতে হবে। চলে যাওয়ার ঘণ্টা বেজেছে। কালকের ভোরের সূর্যোদয় দেখতে পাব কি না জানি না। জানো বাবুজি, আমাদের এই বয়সটা এগোলেও ভয়, পিছলেও ভয়। একটা বুলেট আমার জন্য বরাদ্দ করা আছে। যে কোনো মুহূর্তে আমাকে তা ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। বিদায় বাবুরা। গোস্তাকি মাপ করবেন। যাওয়ার সময় একটা কথা বলে যাই — বাঙালিদের আমরা খুব পছন্দ করি।

আশ্চর্য, যাওয়ার সময়েও ছেলেটি বাঙালিত্বের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে মনটাকে নরম করে দিয়ে গেল। কেমন একটা মায়া হল ছেলেটার ওপর। বারংবার মনে হল, ও যে কাজে ব্রতী, সেটা অনিচ্ছের সঙ্গে বাধ্য হয়ে করছে। না করে উপায় নেই। তাই বলে গেল ফেরার রাস্তা বন্ধ তার। একটা বুলেটের সুতোয় তার প্রাণটা বাঁধা।

শ্রীনগরের পথে চলতে চলতে বেশি করে মেয়েদের দেখেছি। মুসলমান হলেও এরা কেউ বোরখা পরে না। প্রত্যেকটি মেয়ের গায়ের রঙ আপেলের মত। পর্যটকদের চোখে শুকতারা আলো ছড়ায় তারা। বেশিরভাগ লোকই গরিব। জামাকাপড় নোংরা হলেও প্রকৃতি এদের দেহসৌষ্ঠবে সৌন্দর্যের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। সমস্ত দেহে সুকান্তির স্নিগ্ধ আভা। আরক্তিম মুখাবয়ব পটে আঁকা ছবির মত। তীক্ষ্ণ নাক, ঘন কালো কিংবা বাদামী রঙের বাঁকা ভুরু। নীলাভ চোখের স্বচ্ছতায় নয়ন মণিটি যেন পদ্মপাতায় নীরবিন্দুর মত টলটল করে ভাসছে। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে সৌন্দর্যের রানী হওয়া সত্ত্বেও রূপচর্চায় তারা উদাসীন। সারা গায়ে পুঞ্জিত ময়লা। জামাকাপড়ও তেমনি। কাছ দিয়ে গেলে গা দিয়ে গন্ধ বেরোয়। কিন্তু দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের সারল্য এবং অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য সদাহাস্যময় করে রেখেছে।

কাশ্মীরী মেয়েরা ভীষণ পরিশ্রমী। সর্বদা কর্মরত। ঘরে বাইরে গরিব ঘরের রমণীরা পুরুষদের সঙ্গে সমান কর্মরতা। মাঠে-ধানের বীজ ছড়াচ্ছে, ঘরে রাঁধছে, হাঁস-মুরগী, ছাগল, গরু চরাচ্ছে। বনে বনে কাঠ কুড়োচ্ছে, কাঠের বোঝা, ঘাসের বোঝা পিঠে করে ঘরে ফিরছে, বাজারে সওদা করছে। গরিবঘরের কাশ্মীরী মেয়েরা গৃহবন্দী বা পর্দানসীন নয়। সর্বত্রই তাদের দেখতে পাওয়া যায়। চোখ চেয়ে দেখার মতই তারা।

এই পার্বত্যদেশে একদিন পর্বতকন্যা উমার ভুবনমোহিনী রূপ শিবের তপস্যা ভঙ্গ করেছিল। এখানেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ এবং মিলন। মহাবীর কার্তিকের জন্মও

এই হিমালয়ে। এসব পৌরাণিক উপাখ্যান হলেও নারীরা এখানে কোন রূপকথার নায়িকা নন। তারা সত্যিই জীবন্ত রূপের এক একটি পরম প্রতিমূর্তি। তাই তো শিবকেও পার্বতীর ভুবনমোহিনী রূপের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। শিব যত বড় তপস্বী হোন না কেন, পার্বতীর রূপের ছটায় তিনি বিমোহিত হন। পার্বতীর অবয়বের মধ্যে এমন একটা অনির্বচনীয় সৌন্দর্য আছে যা শিবকেও মুগ্ধ করেছিল। শিবও ভুলতে পারেনি তার নীলাভ চোখের স্বচ্ছতার দ্যুতি। আঁখি পল্লবের নীলাঞ্জন ছায়া। চাঁপাকলির মত সুডৌল ও সূক্ষ্মাগ্র আঙুলগুলি, পানপাতার মত মুখ, টিকোল নাক, নাকের ডগায় সোনার নথ। আরও কত কি? সারা অঙ্গে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। সেই অপরূপ সাজে সজ্জিতা পার্বতীকে ভুলে শিবের তপস্যায় মন বসল না। অগত্যা তাকে বরণ করে শান্ত করলেন নিজেকে। কাশ্মীরের উন্মুক্ত পটে তাঁকে অনুভব না করলে কাশ্মীর দর্শন কি পূর্ণ হয়!

পথে পথে বেড়াচ্ছি। কিন্তু মনের ভেতর একটা ভয় সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে। উর্দিপরা, মিলিটারি এবং সি. আর. পি. জওয়ানদের সশস্ত্র পাহারা পর্যটকদের ভুলে থাকতে দেয় না পাকিস্তানী হামলা। কার্গিলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধোন্মাদনা আতঙ্ক পর্যটকদের মনে আর একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অতর্কিতে যে-কোন সময় যে-কোন জায়গায় বুলেট বা রকেট গর্জে উঠতে পারে। রক্তে ভেসে যেতে পারে শ্রীনগরের মাটি। রোজই হচ্ছে। তবু ওর মধ্যেই কাশ্মীরীদের নাড়ীর স্পন্দন অব্যাহত আছে। সময়ের স্রোতে জীবন ছুটেছে। বুলেটে আহত ঘোড়ার মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। কাশ্মীরের মানুষ এসবে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই দোকান-পাট মানুষের চলাফেরা স্তব্ধ হয়ে যায় না। কিছুক্ষণের জন্য জায়গাটা থমথম করে। তারপর চাপ চাপ রক্ত জলে ধুয়ে ফেললে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। মাঝখানের এই যতিচিহ্নের কথা কেউ মনে রাখে না।

কাশ্মীর মানেই রক্তারক্তি, হানাহানি। অনন্তকাল ধরে এভাবেই চলে আসছে। পৌরাণিক যুগে দেব-দৈত্যের লড়াই নিত্য লেগেছিল। তারা গেল তো এল বিদেশী হানাদার, তস্কর। কারণ প্রকৃতি নিকেতন কাশ্মীরের কাছে হাত পাতলে শস্য, সম্পদ, অনেক কিছু পাওয়া যায়। এসবের লোভে কাশ্মীর চির অশান্ত। দেব-দানব থেকে আরম্ভ করে, একালের হানাদার, হুণ, মোগল, তাতার সবাই এসে পাত পেড়ে খেয়ে গেছে কাশ্মীরে। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় লুটেপুটে নিয়ে গেছে কাশ্মীরের ধনসম্পদ, মান-ইজ্জত, ধর্ম, এমনকি নারীকে। নবগঠিত পাকিস্তান কাশ্মীরে প্রথম হানাদার বাহিনী পাঠাল যখন, ইতিহাসের পুনারবৃত্তি হল তখনও। ধর্মপ্রাণ মুসলমান

তাদের জাতভাই হওয়া সত্ত্বেও বর্বরের মত লুণ্ঠন করেছে কাশ্মীরের ধন-মান সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য, ঐতিহ্য সব। সেই সঙ্গে শয়ে শয়ে নারীকেও লুণ্ঠন করল ভোগ করল, চালান করল পাকিস্তানে। বিক্রী করে দিল আরব দেশে। মুসলমান বলে খাতির করল না। এটাই হল কাশ্মীরবাসীর ভাগ্যলিখন। কাশ্মীরের ইতিহাস। অথচ, কী আশ্চর্য! এদেশের মানুষ এর সঙ্গে কিছুমাত্র জড়িত না। তবু দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয় তাদের। বলতে কি সেই অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এবং ট্রাডিশন আজও চলেছে! প্রতিবেশী পাকিস্তান রাষ্ট্রের অপচ্ছায়া কাশ্মীরকে অশান্ত করে তুলেছে। কাশ্মীর আজ বড় বিপন্ন। মুসলিম হানাদারেরা আজ নয়, আগেও কাশ্মীরের সুখ, শান্তি নষ্ট করেছে, নারীকে লুণ্ঠন করেছে, ধর্মের ওপর বলাৎকার করেছে। কাশ্মীরের মুসলিম হানাদারদের চরিত্র একটুও বদলায়নি। বোধ হয় নারকীয় হত্যাকাণ্ড, নারীর সতীত্বনাশ, মানুষের ধর্মনাশ, আগ্রাসী মুসলিম অভিযানের সংস্কৃতি প্রতিবেশী পাকিস্তান রাষ্ট্রের গভীরে নিহিত। কিন্তু ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি আজও মিলনাত্মক। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারাটি আজও সযত্নে পালন করে। শুধু তাই নয় পাকিস্তানিরাও এই ভারতের মাটি থেকে রস শোষণ করে বড় হয়েছে। তাদের জীবনের মধ্যে এখনও ভারতীয়ত্ব সুপ্ত আছে। তবু ভ্রাতৃবিরোধের হলাহল পান করে তারা নির্দয়, নির্মম। এমনটা হল কী করে এই প্রশ্নটা কাশ্মীরের ভারতীয় পর্যটকদের মনে ঘুরে-ফিরে আসে বারবার।

অগ্নিগর্ভ কাশ্মীরের অবস্থা বড়ই করুণ। সর্বত্রই একটা অশান্ত অস্থিরতায় মধ্যে মানুষগুলি দিন কাটাচ্ছে। সেখানে কথায় কথায় হত্যাকাণ্ড এবং অপহরণ চলছে। তবু কোন বিচার নেই, অন্যায়ের প্রতিকার নেই, হত্যার শাস্তি নেই। অপরাধীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা নেই। এমন কি বেঁচে থাকার মত পর্যাপ্ত অর্থও নেই। চারদিকে হাহাকার। মিথ্যে প্রচারের শিকার হচ্ছে। তবু কাশ্মীরবাসীর চোখ খুলছে না। আসলে ধর্মের আফিম খেয়ে তারা ঘুমোচ্ছে।

শ্রীনগরের অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কবি মন কেড়ে নিয়েছিল। সমস্ত সত্তার মধ্যে সৌন্দর্য যেন লাফ মেরে উঠল। আত্মময় হওয়ার নিরালা পরিবেশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধকণ্ঠে বললেন : স্বর্গ-কোথাও আছে কি না জানি না। তবে কোথাও যদি তা থেকে থাকে, তা আছে এইখানেই। এই জায়গাটা যেন পৃথিবীর সেই স্বর্গভূমি। সে কারণে আমরাও বলি কাশ্মীর হল ভারতের ভূস্বর্গ। আমি সেই ভূস্বর্গকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি কাশ্মীরের শ্রীনগরে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি কাঙ্ক্ষিত ভূস্বর্গটি। এমন কি অনুভবের মধ্যে পাইনি তার স্বর্গীয় মাধুর্য। মুক্ত

মনে, মুক্ত চোখে এই দেশের কোটি কোটি মানুষ যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে আমার মনের মর্মস্থলে তার জন্য উথাল-পাথাল হওয়ার সেই ভাবটি কোথায়? আমার এই অকপট স্বীকারোক্তি মূর্খের মূর্খামি তো বটেই, বোধ হয় আমার ঔদ্ধত্যও। আমার মত এত বড় বেরসিকের কাশ্মীর দেখতে যাওয়া যে উচিত হয়নি, ওখানে গিয়ে তা মনে হল। তবে কি কাশ্মীরকে গভীর করে জানার আগ্রহ আমার মধ্যে প্রবল। তবে গাড়ি করে আসার সময় জানলা দিয়ে দেখা নীলগঙ্গার স্রোত, তার পাহাড়ী গাছ-গাছালি বিশেষ করে চেনার, পাইন, দেবদারু দেখে মনে মনে কতবার বলেছি, আহা কি অপরূপ। বারে বারে মনে হচ্ছে এই নীরবতাই সবচেয়ে বেশি বাণীময়।

বহু নীচ দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে যাওয়া বিতস্তা নদীর ঝরঝর শব্দ; এক অবিশ্বাস্য, অনাবিল নতুন অনুভূতি এনে দিয়েছিল। সুন্দরের এক পরম অনুভূতি হয়েছিল। সে অনুভূতি পরমের। ঈশ্বর আছে কি নেই, এই প্রশ্ন জেগেছিল। কিন্তু সৌন্দর্য তো আছে। আছে থরে থরে পরম বিস্ময় ছড়ানো। অন্তরীক্ষে একজন সর্বশক্তিমান কেউ আছেন, নইলে এসব কথা মনকে নাড়া দেয় কেন? তবে কি পৃথিবী, ঈশ্বর, ভগবান পরম এসব পুরো মানুষের মনের সৃষ্টি। মনে করলেই এসব আছে, নইলে নেই। আশ্চর্য লাগে নিজেকে। নির্জনতার অনুভূতি বিশ্বাস অবিশ্বাসের সঙ্গে মিলেমিশে একটা গোলমাল পাকিয়ে ফেলে। তাই বোধ হয় কাশ্মীরের শ্রীনগরের শ্রী আমি কোথাও দেখতে পাইনি।

শ্রীনগরের সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল ডাল লেক। পুরাণের সতীসায়রের আধুনিক নাম হল ডাল লেক। কাশ্মীরের প্রাণস্পন্দন ডাল হ্রদকে ঘিরে। একে শ্রীনগরের প্রাণভোমরা বলা যায়। হতভাগ্য দরিদ্র, কাশ্মীরীদের বিদুরের খুদ সঞ্চিত আছে ডাল হ্রদের সুশীতল জলে। গোটা কাশ্মীরের ভরণপোষণ করছে জননীস্থানীয় ডালহ্রদ। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-উপভোগ করতেই কাশ্মীরে আসে লোকে। কিন্তু আমার মত অনেককেই হতাশ হতে হয়। সৌন্দর্যের রানীর ডালহ্রদের অপরূপ শোভা কার অভিশাপে এমন শ্রীহীন হল! কোথায় হারিয়ে গেল সেই কবিকল্পনা? রাশি রাশি ফুল নিয়ে শিকারা করে ঘুরে বেড়ানো জলপরীদের কোথাও খুঁজে পেলাম না? ফুল নেই, জলপরীও নেই। কিন্তু আগুনের মত লাল আর টসটসে কাশ্মীরী মেয়ে ও ছেলে নানারকম পসরা সাজিয়ে পথ আলো করে ডাল লেকের ধারে বসে আছে। কথায় বার্তায়, আচার আচরণে চাল চলনে কত স্বতস্ফূর্ত তারা। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পর্দানসীন নয় মেয়েরা। একটা লাজুক, কৌতুকপ্রিয় সপ্রতিভভাব তাদের চোখেমুখে ফুটে থাকে। কথা বলে ধীরে ধীরে, সুরেলা কণ্ঠে।

ডাল হ্রদের বুক থেকে উঠে আসা শীতল বাতাসে হৃদয়-মন জুড়িয়ে যায়। শিকারা করে ডাল হ্রদে রাজহংসের মত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনটা বিক্ষোভে ভরে যায়। কী প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের ডাল লেককে এমন সুন্দর করে গড়ার? যদি তাকে এমন করে বন্ধ্যা করা হয় তাহলে কীসের আকর্ষণে পর্যটকেরা এখানে ভিড় করবে? কবিমন শত আর্তনাদ করলেও বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে পাবে না এর সৃষ্টির সার্থকতা। অতীতের কবিকল্পনায় ডাল লেক আর ডাল লেক নেই। একী পরিহাস বিশ্বদেবতার। সংস্কৃতি, সভ্যতা ও প্রগতির নামে এ কোন শূন্যতার পেছনে ছুটে চলেছি! মনের অনুভূতি যেন নিস্পন্দ হয়ে গেছে। অঙ্কের হিসেব মেলাতে গিয়ে যেন শূন্য হয়ে গেছি। শূন্যকে নিয়েই এই কাশ্মীরের সব মূল্য?

কতক্ষণ ডাল হ্রদে শিকারা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি জানি না। সময়ও যেন নিশ্চল হয়ে গেছে। শিকারা করেই নাসিমবাগের ঘাটে পৌঁছলাম। শিকারার মাঝি মুস্তাফা বললে, নাসিম মানে সকালের বাতাস! এই বাগিচায় দাঁড়িয়ে ডাল লেকের শোভা দেখতেন বাদশাহ্ আকবর। আর সকালের ফুরফুরে স্নিগ্ধ শীতল বাতাস উপভোগ করতেন। পুলক লাগত দেহে ও মনে। কী ভালোই-না লাগত তখন। মনে হত, পৃথিবীর আর কোনো সম্পদ নয়, শুধু ডাল লেককে চাই একান্তে, প্রেয়সী নারীর মত।

আকবর পুত্র জাহাঙ্গীরের মন কেড়ে নিয়েছিল কাশ্মীর। কাশ্মীর এত ভাল লেগেছিল যে তাঁর জীবদ্দশায় অর্থাৎ তাঁর বাইশ বছর রাজত্বকালে আটবার কাশ্মীর এসেছিলেন। বোধহয় জাহাঙ্গীরের মত এত গভীর করে কাশ্মীরকে অন্য কোন মোগল সম্রাট বা অন্য কোনো বাদশাহ ভালোবাসেনি। কাশ্মীরে যাওয়া আসা তখন আজকের মত এত সহজ ছিল না। দু'খানা পা ভরসা করে দুর্গম গিরি কান্তার অতিক্রম করে কাশ্মীর আসতে হত। অবশ্য জাহাঙ্গীর আসতেন কশ্যপ যে পথে কাশ্মীর ঢুকেছিল সেই পথে। ঝিলমের উপত্যকা ধরে ভিমবের ও পাখালি হয়ে কাশ্মীরে আসতেন ঘোড়ায় চেপে এবং পাল্কী করে।

একটু হেঁটে গেলেই শালিমার বাগ। শালিমার মানে প্রেমের আবাস। শিকারার চালক মুস্তাফার কাছেই এর অর্থ জেনেছিলাম। মুস্তাফাই বলেছিল জাহাঙ্গীর বাদশাহ নূরজাহান বেগমকে খুশি করার জন্য এই বাগিচা উপহার দিয়েছিলেন। তাজমহল যদি মমতাজের প্রেমের জন্য অমর হয়ে থাকে তাহলে শালিমার বাগিচা নূরজাহানের প্রতি জাহাঙ্গীরের অমর প্রেম বুকে নিয়ে চিরদিন মানুষের কানে কানে বাতাসের স্বরে ডাল লেক কথা কইবে। ডাল লেকের উত্তর-পূর্ব কোণে এই বাগিচা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে

বারশো হাত আর পাঁচশত হাত চওড়া। দশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু চেনার গাছের আড়ালে ঐ দেয়াল দেখা যায় না।

বাগানের ভিতরে পৌঁছে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কী প্রাণবন্ত, আর কী অফুরন্ত প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য নিয়ে মানুষের হৃদয় মন জয় করছে। তাকে প্রেমে পাগল করছে। জাহাঙ্গীরের উদ্দাম প্রেম যে কোন বয়সের নরনারীকে মুহূর্তে একটু উচ্ছল করে তোলে। ফুরিয়ে যাওয়া জীবনের ভেতর যে এখনও প্রেম নামে মহামূল্যবান বস্তুটি সজীব এবং জীবন্ত আছে তা শালিমার বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ভীষণভাবে অনুভব করি। জীবনের ভোঁতা অনুভূতিগুলো প্রেমবোধে নবীকৃত হয়ে ওঠে। নতুন করে প্রাণ পায় তারা। কার্পেটের মত সবুজ ঘাসে বসে দেখতে ভাল লাগে পিছনে পর্বত, আর পাদদেশে ফুলের বাগান ধাপে ধাপে নেমে গেছে। অজস্র ফোয়ারা থেকে নির্গত জলরাশি ঝরনার মত গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। পায়ের চলার পথের ধারে যে কৃত্রিম ঝরনাগুলো আছে, সেগুলো মানুষের অযত্নে, অব্যবহারে শুকিয়ে গেছে। সেখান থেকে জল ফিনকি দিয়ে বেরোয় না। তবে, তারা যে ছিল একদিন এবং ভীষণভাবে ছিল সেই অস্তিত্বটিকে জানান দেয়।

একদল বিদেশী ট্যুরিস্টদের পেছন পেছন যেতে যেতে গাইডের মুখে সম্পূর্ণ অন্য কথা শুনে একটু আশ্চর্য হলাম। গাইড বলছিল : লোকে জানে নূরজাহানের রূপের মোহে পাগল হয়েছিল জাহাঙ্গীর। কিন্তু নূরজাহানও যে জাহাঙ্গীরের প্রেমে পাগল হয়েছিলেন এই সত্যটা বিশ্ববাসীকে জানাতেই জাহাঙ্গীর মহিষী ভারতের ভূস্বর্গ কাশ্মীরে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বুকের মধ্যিখানে এই প্রেমোদ্যান রচনা করেছিলেন। ডাল লেকের দিকে মুখ করে রাতের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রেমালাপে দু'জন বিভোর হয়ে থাকার জন্য কালো মার্বেল পাথরের বাড়ি করেছিল। আকাশের নক্ষত্র ও দু'পাশে তার ঘর আর মাঝখানে খোলা। কয়েকটি কালো পাথরের মসৃণ থামের ওপর চার চালার মতো রঙীন ছাদ। আর তার পাশ দিয়ে নেমে এসেছে ঝরনা। তার অবিরাম ঝির ঝির শব্দে চাপা পড়ে থাকে তাদের মধুর প্রেমালাপ। কিন্তু পরিচর্যার অভাবে এসবই কল্পনা করে নিতে হয় এখন।

কিন্তু এক ভীষণ ধন্দে পড়লাম আমি। সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার? হৃদয়ের গোপনতম স্থানে লুকিয়ে রাখা প্রেমের কথা কে জানতে পারে? মানুষের মনস্তত্ত্ব বড় জটিল। নদীর মতই কখন যে মনের চোরাস্রোত কোন দিকে দিক পরিবর্তন করবে মনও জানে না। ইতিহাসই কি জানে? প্রশ্নটা মনে হওয়ার কারণ অনেক জল ঘোলা করে সেলিম মেহেরউন্নিসা বা নূরজাহানকে সম্রাজ্ঞীরূপে

পেয়েছিল। মেহেরউন্নিসা ছিল মোগল সম্রাটের একজন অধস্তন রাজকর্মচারীর কন্যা। তার সঙ্গে কখনও সম্রাটের ছেলের বিয়ে হয়? তবু ওদের নিয়তি একদিন এক পারিবারিক উৎসবে উভয়কে মিলিয়ে দিল। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল মেহেরউন্নিসাদের বাড়িতেই। উৎসবের শেষে সবাই যখন একে একে বিদায় নিল তখন মেহেরউন্নিসা এল সম্রাট পুত্রকে সুরাপানে আপ্যায়িত করতে। জাহাঙ্গীরের হারেমে দেশ বিদেশের সুন্দরী রমণীর অভাব নেই। কিন্তু তারা কেউ মেহেরউন্নিসার মত সুন্দরী নয়। তার রূপলাবণ্য সম্পূর্ণ অন্য এক পৃথিবীর। স্বপ্নের রাণী সে। জাহাঙ্গীর তাকে দেখে মুগ্ধ। চোখের পলক পড়ে না। হ্যাংলার মত দেখছিল তাকে। সম্রাটপুত্রের অবস্থা দেখে মেহেরউন্নিসা লাজুক অপ্রতিভতায় তাঁর হাতে সুরাপাত্র তুলে দিল। তারপর গজল গেয়ে মাত করে দিল। সঙ্গে ঘুঙুরের তুফান তুলে নাচল, সেলিমকে একেবারে সম্মোহিত করে ফেলল।

সেলিমের মুগ্ধ হওয়ার সংবাদ আকবরের কানে গেল। ঘটনাটা বেশিদূর গড়ানোর আগেই অধস্তন রাজকর্মচারী শের আফগানের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার বিবাহ দিলেন। এবং সুদূর বঙ্গে সুবাদার করে পাঠিয়ে দিলেন তাকে। মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান। কিন্তু সেলিম ভুলে থাকতে পারলেন না মেহেরউন্নিসাকে। মেহেরকে তাঁর চাই। শের আফগানকে হত্যা করে মেহেরউন্নিসাকে নিজের হারেমে এনে রাখলেন জাহাঙ্গীর। যাকে রাজরানী করতে পারতেন তাকে রাখলেন হারেমে। পরে মেহেরকে বিয়ে করে নূরজাহান নাম দিলেন। নূরজাহান মানে জগতের আলো। সম্রাজ্ঞী হয়ে নূরজাহান হারেমে থাকার অপমানের প্রতিশোধ নিতে জাহাঙ্গীরকে নিজের অধীন করে রেখেছিলেন। জাহাঙ্গীরের নামের অন্তরালে থেকে কার্যত তিনি রাজ্যশাসন করতেন। প্রেম ছিল জাহাঙ্গীরের মনে। কিন্তু নূরজাহানের হৃদয়ে জাহাঙ্গীরের জন্য সত্যি কোন প্রেম ছিল কি না সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নূরজাহান ভালবেসেছিল কর্তৃত্বকে, আধিপত্যকে। মোগল সাম্রাজ্যের বিলাস এবং বৈভব, জাহাঙ্গীরে বশ্যতা এবং আনুগত্য ছিল তার আসল প্রাপ্তি। তাই জাহাঙ্গীরের প্রতি প্রেমে নূরজাহান এই উদ্যান নির্মাণ করেছে বলে আমার মনে হয় না। এই উদ্যোন যেই করে থাকুক, এখানে এলে ভাল লাগে। এর স্নিগ্ধ হাওয়ায়, মনোরম পরিবেশে মনটা নবীকৃত হয়ে ওঠে।

শালিমার বাগ থেকে আরও কিছুটা গেলে নিশাতবাগ। যার মানে প্রমোদউদ্যান। এটি রাজশ্যালক এবং নূরজাহানের ভাই আসফ শাহর তৈরি। ইনি ছিলেন শাহজাহানের প্রধানমন্ত্রী। সম্ভবত ব্যাপ্তির দিক থেকে শালিমার বাগের চেয়ে বড়।

ডাললেকের ধারেই অবস্থিত। নাসিমবাগ, শালিমার বাগ এবং নিশাতবাগকে একত্রে বলা হয় মোগল গার্ডেন। মোগল রাজাদের কীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তিনটি উদ্যানের মধ্যে শালিমার বাগকে আমার বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। সব উদ্যানের গড়ন একই ধরনের। বোধহয় একই প্রাকৃতিক পরিবেশে পাশাপাশি অবস্থিত বলেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়নি। এর ভেতর চশমাশাহী বাগটি একটু অন্যরকম। পটভূমি ভিন্ন হওয়ার জন্য অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যে, সাজসজ্জায়, গাছ-গাছালির নূতনত্বে, ভ্রমণের রম্য আকর্ষণে চশমাশাহী পর্যটকদের মন হরণ করে। চশমাশাহী মানে রাজকীয় ঝরনা। সৌন্দর্যপ্রেমিক সাজাহানের জাদু হাতের স্পর্শ এই উদ্যানকে একটি দর্শনীয় উদ্যানে পরিণত করেছে। এই উদ্যানে একটি বিশাল জলাশয় আছে, কিছু সংস্কারের অভাবে জলজ উদ্ভিদের চাপে তার নাভিশ্বাস উঠছে। তবু তার মধ্যে যেটুকু জায়গা এখনও স্বচ্ছ জলে টল টল করছে সেখানে পড়েছে নীল আকাশের ছায়া নীল আরও নীল হয়ে উঠেছে।

শ্রীনগরের যা কিছু আছে রূপে রঙে রসে তার সব কিছু ডাল লেক বেষ্টন করে। দর্শনীয় স্থানগুলো ডাল লোকের ধারে সুপ্রাচীনকাল থেকে তাদের জায়গা করে নিয়েছে। ডাল লেককে কেন্দ্র করেই কাশ্মীরের সমৃদ্ধি।

সে যাইহোক এই জায়গায় স্বর্গ নেমে এসেছে। শ্রীনগরের জীবন হল ডাল লেক। হিন্দু-মুসলমানের মন্দির-মসজিদও এই ডাল লেকের পাশে। একদিকে পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত শঙ্করাচার্যের মন্দির, অন্যদিকে সমতলে রয়েছে মুসলিমদের হজরত বাল মসজিদ। প্রায় পাঁচশ'র মত সিঁড়ি ভেঙে বহু কষ্ট স্বীকার করে তবে শঙ্করাচার্যের মন্দিরে পৌঁছনো যায়। এ হল শিবমন্দির।

কেরালার মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর এবং যোগিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য বদ্রীনাথের যাওয়ার পথে কাশ্মীরে এসেছিলেন। সেই সময় বৌদ্ধ ও জৈনদের চাপে হিন্দুধর্মের নাভিশ্বাস উঠেছিল। সেই সঙ্কটের যুগে আচার্য শঙ্কর তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে সর্বশূন্যবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধমত খণ্ডন করে হিন্দুধর্মকে পুনরায় আপন মহিমা দান করেন। কিন্তু কারও ওপর জোর করে আপন ধর্মমত চাপিয়ে দেননি। আপন অদ্বৈতবাদের পক্ষেই সওয়াল করেছেন। সে সব ইতিহাসের কথা। তাঁর কাশ্মীর পদার্পণকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য হিন্দু রাজা জলক-এর প্রতিষ্ঠিত এই শিবমন্দিরের নতুন নামকরণ করা হয় শঙ্করাচার্যের মন্দির। এখানকার পাথরনির্মিত শিবলিঙ্গের উচ্চতা পাঁচফুটের মত। হিন্দু সংস্কৃতির কালজয়ী মহিমা নিয়ে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে এই মন্দিরটি টিকে আছে।

ডাললেকের যে অংশ বিতস্তা নদীর সঙ্গে মিশেছে সেইদিকেই হজরত বাল মসজিদ। কাশ্মীরের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এখানে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের প্রসিদ্ধ বাল সংরক্ষিত আছে।

হজরতবাল চুরি যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মসজিদ প্রচারের শিরোনামায় উঠে আসে। শুধু তাই নয়, পবিত্র ধর্মস্থানকে কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদীরা তাদের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের ঘাঁটি করে ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ধর্মস্থানের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার বিরুদ্ধে কাশ্মীরের কোন মুসলমান সরব হয়নি। বরং তাদের প্রশ্রয়ে ও মদতে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গীবাহিনী কাশ্মীরের সব সুস্থিতি নষ্ট করে। স্থানীয় মুসলিম অধিবাসীরা, মৌলবীরা কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করেনি। বরং তাদের প্রচ্ছন্ন মদতে কাশ্মীর অশান্ত হয়ে ওঠে। ভারত যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেজন্য ধর্মস্থানের ওপর কোনরকম হস্তক্ষেপ না করার সংযম দেখিয়েছিল ভারত সরকার। কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা ভারত সরকারের এই দুর্বলতাকে মূলধন করে তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলল। এদের অবস্থানের ফলে যে হজরতবালের শুচিতা নষ্ট হচ্ছে এবং তার জন্য মুসলমান ধর্মগুরুদেরও যে কিছু মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ছিল সেটা তাঁরা করেননি। ভারত সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ভারত সরকারের দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক দলগুলির মুসলিম তোষণনীতির সুযোগগুলিকে সন্ত্রাসবাদীরা আত্মরক্ষার হাতিয়ার করে তুলেছিল। পরে অবশ্য নিরাপত্তার স্বার্থে এবং মুসলিমদের ধর্মীয় জীবন যাপনের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে কঠোর হতে হয়। দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে মসজিদটিকে মুক্ত করতে সেনাবাহিনী নামাতে হয়। এবং বহু রক্তপাত ঘটিয়ে বহু প্রাণের মূল্যে হজরতবালকে সন্ত্রাসবাদীদের দখলমুক্ত করা হয়। মসজিদটি যাতে পুনরায় হানাদার বাহিনীর হস্তগত না হয় সেজন্য কড়া মিলিটারি পাহারায় রাখা হয়েছে। অষ্টপ্রহর মসজিদের ভেতরও বাইরে সি.আর.পি. জওয়ানরা এল.এম.জি হাতে পাহারা দিচ্ছে। সাদা পোশাকের পুলিশ ও গোয়েন্দা মসজিদের আশপাশে ছড়িয়ে আছে। দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের ওপর কড়া নজর রাখছে তারাই। মসজিদের ছিমছাম পরিবেশের শান্ত-সৌম্য পবিত্রতা দর্শনার্থীদের ভাল লাগে। ধর্মপ্রাণ মানুষের গভীর ভালবাসা দিয়ে মোড়া এই মসজিদ। মস্তক আচ্ছাদিত করে মহিলারা বাদে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের প্রবেশের অধিকার আছে। কেবল মহিলা হওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গিনীরা মসজিদে প্রবেশাধিকার পেল না বলে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। ধর্মীয় জীবন

যাপনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আত্মগ্লানি বাইরে প্রার্থনারত মুসলিম মহিলাদের মধ্যে দেখিনি। বরং তাদের হয়ে আমার সঙ্গিনীরা নারী স্বাধীনতা নিয়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা করল। কিন্তু তাদের তর্জন গর্জনে অধিকারহীনা নারীদের কোনো সৌভাগ্যোদয় হবে না। মিছেই অরণ্যে রোদন করা সার হল।

পরিশেষে, আবার বলি, কাশ্মীর হল হিন্দু রাজ্য। এখানকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্যও হিন্দুর। সমগ্র কাশ্মীরে এখনও হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঐতিহ্য ছাড়া অপর কোন জাতির প্রাচীন কীর্তি নেই। কাশ্মীর ছিল জ্ঞান, বিদ্যা, কাব্য, ধর্ম-চর্চার পীঠভূমি। কলহনের ভাষায় শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী হিন্দু রাজত্বকালেই কাশ্মীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূভাগে পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষাত্রশক্তি রাজকীয় শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনে ছিল উদাসীন। তাই বহিঃশত্রুর কাছে কাশ্মীর অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। এখনও পর্যন্ত বিদেশী হানাদারের ছোবল থেকে কাশ্মীর মুক্ত হয়নি। কাশ্মীরের বুক থেকে সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর অত্যাচারের অবসান হয়নি।

কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। কিন্তু তার আগে মুসলমান সাম্রাজ্যবাদী শাসক জুলফি কাদির তাতার শোণিত তরবারি থেকে শুধু রক্ত ঝরেনি, লুণ্ঠন, ধর্ষণ কাশ্মীরের জনজীবনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সেই রক্তগঙ্গার পথ ধরে এল গজনীর আহম্মদ। এল পাঠান, মোগল একই পথে। একই রূপে। একশ বছর ধরে পাঠান সুলতানদের হাতে উৎপীড়িত হল এই দেশ। ধন, সম্পদ, মান, ধর্ম, ঐতিহ্য সব হারিয়ে কাশ্মীর একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। হিন্দুপ্রধান দেশের দেব-দেবীর মূর্তি, মন্দির, হিন্দু স্থাপত্যের সব নিদর্শন মুছে দিল সুলতান শাসকের দলবল। সুলতানদের হিন্দু আক্রোশের কলঙ্ককাহিনীতে ভরা কাশ্মীর। মুসলমানী দস্যুতার আঘাতে, পাশবিক অত্যাচারে তাদের অবস্থা কত করুণ হয়েছিল আজকের কাশ্মীরে তালিবানদের ভাড়াটে সৈন্য এবং পাকিস্তানের হামলাবাজদের আক্রমণ এবং নিষ্ঠুরতার দিকে তাকালে তা সহজে অনুভব করা যায়। কাশ্মীরে চিরদিন যা হয়েছে আজও তা অব্যাহত রয়েছে। কেবল পটভূমি আলাদা। কাশ্মীরে জনসংখ্যার অধিকাংশ ধর্মান্তরিত মুসলমান। তবু, মুসলমান শাসকেরা তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছুই করেনি। কাশ্মীরের দরিদ্র মুসলমানেরা মুসলমান শাসকের আমলেও যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই রয়ে গেল। তারা শ্রমিক, মুটে, মজুর, চাকর-বাকর পাচক হয়েই জীবন কাটাল। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও তারা মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে কিছুই পায়নি। শুধু অত্যাচার আর গঞ্জনাই জুটেছিল। বোধহয় এই কারণে তারা পৃথিবীর আর সব মুসলমান থেকে একটু স্বতন্ত্র। এরা মুসলমান

হয়েও দাড়ি রাখে না, নামাজ পড়ে না। ঈদে গরুর মাংস খায় না। বরং একটু বেশি হিন্দু-ঘেঁষা। হিন্দুর ঘরে রুজি-রোজগার করে। আশ্চর্যের কথা একজন গোঁড়া কাশ্মীরী ব্রাহ্মণও মুসলিম পাচকের রান্না পরিতৃপ্তির সঙ্গে খান। বিধর্মী বলে উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে দেখেন না। তাদের জাতধর্মও মুসলমানের ছায়া পড়ে নষ্ট হয় না। কাশ্মীরের আবহাওয়ায় সর্বত্র একটা মুক্তির হাওয়া বইছে। উঁচু পাহাড়ের দেশে বাস করে বলেই হয়তো তাদের সবার মন উদার। কিন্তু রাজনৈতিক রক্তপাত তাদের উদার থাকতে দিল না। এখন কাশ্মীর উপত্যকায় উল্টো হাওয়া বইছে। প্রতিবেশী ভারতবিদ্বেষী রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান মিলে তাদের প্রাণে বিভেদ-বিদ্বেষের বীজ বুনছে। তাদের মন বিষিয়ে দিচ্ছে। হিন্দুকে শত্রুর চোখে দেখতে শেখাচ্ছে। হিমালয়ের আকাশে বাতাসে কশ্যপের সন্তান-সন্ততির জন্য বসুন্ধরার আকুল করা কান্না : হে দেবাদিদেব মহাদেব, রাক্ষস, দস্যুর হাতে কাশ্মীর আজ বধ্যভূমি। তোমার রাজ্যে তুমি ছাড়া তাদের রক্ষা করার কে আছে? হে দেব, তুমি ধ্যানস্থ থেক না। চোখ মেল। নিজেকে প্রকাশ কর। একদিন ত্রিশূলের আঘাতে জলোদ্ভবকে যেমন সতীসায়রে বিদ্ধ করেছিলে তেমনি এই নরঘাতকদের ওপর ত্রিশূল হেনে কাশ্মীরকে মুক্ত কর।

মহামানবের মিলনতীর্থ অমরনাথ কাশ্মীর হয়েই যেতে হয়। তাই কাশ্মীর ভ্রমণ সেরে অমরনাথের উদ্দেশে যাত্রা করি। শ্রীনগর থেকে পহলগাঁও হয়ে অমরনাথ যাত্রা করতে হয়। কাশ্মীর ভ্রমণ হয়ে যায় অমরনাথ যাত্রার অংশ। অমরনাথের তীর্থ মহিমা প্রচার করতে মহাতপা ভৃগু এসেছিলেন এখানে। বোধহয় তিনিই প্রথম পরিব্রাজক যিনি অমরনাথের তুষারলিঙ্গ দর্শন করেছিলেন। যাত্রার সূচনাও করে গেলেন তিনি। যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে ভৃগু বুঝেছিলেন দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করতে একটি উত্তম ছড়ি বা লাঠির মত বন্ধুকে প্রয়োজন। এটি পর্বতারোহণের সময় তৃতীয় পদ হিসেবে কাজ করে। পিচ্ছিল পথে পা পিছলে পড়া থেকে রক্ষা তো করেই, তা ছাড়া হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করার অস্ত্রও হয়ে ওঠে। তাই, অমরনাথ যাওয়ার আগে ওই ছড়িকে দেবতার অস্ত্র ত্রিশূলের প্রতীক হিসেবে পুজো করা রীতি প্রবর্তন করলেন। একটা ধর্মবিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক রীতির সঙ্গে যুক্ত বলে সব যাত্রীই একে যাত্রার অঙ্গ হিসেবে মান্য করে এবং সঙ্গের ছড়িটিকে সাথী করে পাহাড়ী পথের দুর্গমতা অতিক্রম করে। তাই, ছড়িকে দেবদণ্ডের প্রতীকরূপে যাত্রার পুরোভাগে রেখে অমরনাথের গুহাদর্শনে যাত্রা করে যাত্রীদল। এমন কি অমরনাথ গুহা দর্শনের যে দিনক্ষণ ও তিথি তিনি স্থির করেছিলেন আজও তা যাত্রীরা নিষ্ঠার সঙ্গে অন্যতম আচরণবিধিরূপে মান্য করে। ছড়ি যাত্রা করে শ্রীনগর থেকে। আমরা অবশ্য ছড়ি যাত্রার সঙ্গী হইনি। ভিড় এড়ানোর জন্য ছড়ির যাত্রার আগেই পহেলগাঁও থেকে অমরনাথের উদ্দেশে রওনা হয়েছি।

শ্রীনগর থেকে পহলগাঁওর দূরত্ব ষাট মাইল। মোটরে যেতে সময় লাগে তিন ঘণ্টা। যাত্রাপথে প্রাণোচ্ছল নীল গঙ্গা সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গী ছিল। খুশির জোয়ারে ভাসছিল। সারা পথ নদী, পাহাড় জঙ্গল ও ঝরনার অপরূপ শোভা অবাক বিস্ময়ে দেখতে দেখতে চলেছি। এখানকার আবহাওয়া বড় অদ্ভুত। কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি, কখনও ঘন নীল প্রসন্ন নরম রোদে ছেয়ে যায় বনরাজিনী। ভেড়া, ছাগল, গরু, খচ্চর পাহাড়ের গা বেয়ে নিশ্চিন্ত মনে চড়ে বেড়াচ্ছে। রাখাল বালক লাঠির ওপর ভর করে যাত্রীদের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায়। যাত্রীরা হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। তাতেই তৃপ্তির হাসি ফোটে অধরে।

যেতে যেতে মামলীশ্বর নামে এক গাঁও পড়ে। মহাদেব ও গণেশ এককালে বেড়াতে এসেছিলেন এখানে। জায়গাটা নির্জন নিরিবিলি হওয়ার জন্য মহাদেবের ভাল লাগল। কিংবদন্তি আছে, মহাদেব এখানে সুন্দর একটা গুহার দর্শন পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ধ্যানে বসার বাসনা জাগল তৎক্ষণাৎ। গণেশকে বললেন : পুত্র, ধ্যানের এমন যোগ্য জায়গা ভুবনে খুব কমই আছে। কৈলাসে যে দু'দণ্ড বসে ধ্যান করব দেবতারা তার রাস্তা খোলা রাখেনি। যখন-তখন অভিযোগ আর নালিশ নিয়ে হাজির হচ্ছে। আমার জীবনটা একেবারে জেরবার করে দিল।

গণেশ বলল : মর্ত্যভূমির এই গুহার সন্ধান কেউ রাখে না। ক'দিন এখানে নিশ্চিন্তে ধ্যান করতে পার।

মহাদেব প্রিয় পুত্রের কথায় খুশি হয়ে বলল : ভাল কথা বলেছ। তা হলে তুমি গুহার মুখ পাহারা দাও। কাউকে ঢুকতে দেবে না। ধ্যান না ভাঙা পর্যন্ত সব দর্শন প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেবে। যতবড়ই তিনিই হোন তাঁকে দেখা করতে দেবে না।

বাধ্যপুত্রের মত গণেশ মাথা নাড়ল। বলল : তাই হবে। বিরাট বপু নিয়ে গণেশ গুহার মুখ আগলে বসল। বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না ওখানে কোনো গুহা আছে।

এদিকে কৈলাসে মহাদেবকে খুঁজে না পেয়ে দেবতারা প্রমাদ গুনলেন। চতুর্দিকে তাঁর তত্ত্ব তালাশ করতে লোক পাঠানো হল। তিনি হলেন সব কিছুর মূলে। তাঁকে না হলে ত্রিভুবনের কাজ চলবে কী উপায়ে? মহাদেব অজ্ঞাতবাস করলে যে সৃষ্টি স্থিতি লয় পাবে। সুতরাং সবাই মিলে তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল।

গুহামুখে গণেশকে একা রণংদেহি মূর্তিতে বসে থাকতে দেখে নারদের সন্দেহ হল। গণেশের কাছে ধরা না দিয়ে নারদ চুপি চুপি ইন্দ্রকে গিয়ে ব্যাপারটা বলল। তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র ছুটে এল সেখানে। গণেশ তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল। বলল : তুমি

স্বর্গরাজ ইন্দ্রই হও আর দেবতাদের রাজাই হও পিতার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নেই। ধ্যানভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ইন্দ্র গণেশকে বোঝাতে চেষ্টা করল। অনুনয় করে বলল : গণপতি ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা কর। এ বিশ্বে তিনিই সব। তাঁকে ছাড়া ত্রিভুবন চলে না।

গণেশ বলল : সব জানি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

ইন্দ্র পুনরায় বলল : দেবতারা বিপন্ন। বসুন্ধরা অসহায়। অসুরেরা স্বর্গরাজ্য লুণ্ঠন করতে আসছে। কালক্ষয় করার সময় নেই। ওঁর পরামর্শ এবং সাহায্য ভীষণ জরুরী। এখনই কিছু একটা করতে হবে। নইলে, তুমি আমি সবাই স্বর্গচ্যুত হব।

গণেশ বলল : আমি নিরুপায়। মহেশ্বর নিজে থেকে দেখা না করলে দেখা হবে না। আমাকে অনুরোধ করা নিরর্থক। পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারব না। জান তো, পিতৃআজ্ঞা পালন করার জন্য নচিকেতা যমের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। দরকার হলে আমিও শমন ভবনে যেতে প্রস্তুত, তবু পথ ছাড়ব না।

গণেশের ঔদ্ধত্যে ইন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলল, আমার প্রয়োজনটা এত বেশি যে বাধা দিলে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হব।

সে কথা শুনে গণেশ গেল খেপে! বলল : তবে তাই হোক। যুদ্ধে আমাকে হারিয়ে তবেই গুহায় প্রবেশ করতে পারবেন।

অগত্যা গণেশ ও ইন্দ্রের যুদ্ধ শুরু হল। দিনের পর দিন রাতের পর রাত ধরে সে যুদ্ধ চলল। কয়েকদিন যুদ্ধের পর গণেশ বিশাল বপু নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। খুব পিপাসা পেল। পাশেই বয়ে যাচ্ছিল নদী। এক চুমুকে নদীর সব জল উদরস্থ করে ফেলল। বিপদ বুঝে গণেশের ইঁদুর মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য বাঘ ছাল ধরে টানাটানি শুরু করল। গায়ের ওপর লম্ফঝম্ফ করে অবশেষে তাঁর ধ্যান ভাঙতে সফল হল। ধ্যানচক্ষু উন্মীলন করতে মহাদেব বুঝতে পারলেন কোথাও বড় ধরনের একটা গোলমাল বেধেছে। তৎক্ষণাৎ ত্রিশূল হাতে ছুটে এলেন গুহার বাইরে। যুদ্ধোন্মত্ত ইন্দ্র ও গণেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয়কে নিরস্ত করলেন।

নীলগঙ্গা শুকিয়ে যেতে দেখে মহাদেব তো অবাক। বললেন : নীলগঙ্গা জলহীন করল কে?

গণেশ বলল : ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। তেষ্টা মেটাতেই নীলগঙ্গার সব জল আমার উদরে ঢুকেছে।

মহাদেব বললেন : করেছ কী? নীলগঙ্গা শুকিয়ে গেলে পৃথিবী মরুভূমি হয়ে

যাবে। তারপরেই নীলগঙ্গার প্রবাহকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহাদেব ত্রিশূল দিয়ে গণেশের পেট ফুটো করে নদীর সব জল বের করে দিলেন। লম্বোদর মানে গণেশের উদর থেকে এই নদীর সৃষ্টি বলে এর নাম হল লম্বোদরী। কালক্রমে অপভ্রংশ হল লিডার। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে এই লিডার নদীই নীলগঙ্গা। এমন একটা কাব্যিক নামের পেছনে নিশ্চয় কোনো রোমান্টিক প্রেমের কিংবদন্তি আছে বলে মনে হয়। কারণ এই উপত্যকার প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে, পাহাড়ে, ঝরনায়, সরোবরে, নদীতে ছড়িয়ে আছে হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পুরাণের বহু কথা। বলা বাহুল্য সে কাহিনী হরপার্বতীকে নিয়ে।

নীলগঙ্গার পাশে তীর্থস্থানেশ্বর নামে একটি রমণীয় স্থান আছে। সেখানে মধুচন্দ্রিমার রাত্রি যাপন করতে এসেছিলেন হরপার্বতী। তাঁদের মনের আকাশে কত টুকরো টুকরো রোমাঞ্চকর কথা, কত মন রাঙানো প্রেমালাপের মুগ্ধ করা কথা তাঁরা বলছিলেন। কিন্তু একটা সময় আসে যখন কথা বলার কিছু থাকে না। থাকে শুধু মুখোমুখি বসে থাকার নীরব কটি মুহূর্ত। সেটাই হল প্রেমের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। অনন্ত সময় কোথা দিয়ে বয়ে যায় কেউ টের পায় না। সময় দিয়ে ভাললাগার সেই ক্ষণটুকুও বোধ হয় মাপা যায় না।

চেনার পাইনবনের ফাঁক দিয়ে মেঘে ঢাকা সূর্যের একফালি রোদ পড়েছিল পার্বতীর মুখের ওপর। তাতেই মহাদেবের বুকে কত কী ঘটে গেল। তাঁর স্মিত নয়ন, আত্মস্থ দৃষ্টি, এক দারুণ মুগ্ধতায় চমকে উঠল। সারা দেহমনে এক অনাস্বাদিত পুলকানুভূতি জাগল। কী যেন খুঁজতে লাগলেন পার্বতীর মধ্যে। অধরে সোহাগলালিত দুষ্ট হাসি। পার্বতীরও চোখের তারায় নীরব হাসি ঝিলিক দিল। মহাদেব পার্বতীর দু'পাশে দুটি হাতের পাতা ছুঁয়ে বললেন, তুমি আমার সব পার্বতী। আমার সুখ আমার আনন্দ আমার শান্তি। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার নিজের অস্তিত্ব ভাবতে পারি না। তোমাকে না পেলে আমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে যেত। তুমি আমার তৃষ্ণা মেটানোর মানস সরোবর।

পার্বতী দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিলেন মহাদেবের দু'হাত। বললেন : মেয়ে মানুষের মন রাখতে তার মন গলাতে পুরুষেরা বড় বেশি মিথ্যে কথা বলে। দোষ মেয়েমানুষের। বোকার মত তারা বিশ্বাস করে নিজেকে বিলিয়ে দেয় তাদের কাছে। নীরব আত্মসমর্পণের সুখে ভরে ওঠে। তোমরা পুরুষেরা ভীষণ খারাপ। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতে তোমাদের জুড়ি নেই। আমি কিন্তু তোমার কথায় ভুলছি না।

আশাভঙ্গের বেদনায় ছাই হয়ে গিয়ে মহাদেব সম্মোহিতের মত ডান হাত দিয়ে পার্বতীকে কাছে টেনে নিয়ে মুখ নামিয়ে আনলেন পার্বতীর ঠোঁটের কাছে। আত্মদানের আবেগে পার্বতীর ভেতরটা তখন থরথর করে কাঁপছিল। খুব ইচ্ছে করছিল মহাদেব তাকে জোর করুন, আগ্রাসী চুম্বনে চুম্বনে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিন। হঠাৎই প্রেমমুগ্ধ মহাদেব তৃষ্ণার্ত অধর যুগল পার্বতীর ঠোঁটের ওপর রাখলেন। পার্বতী আপত্তি করলেন না। সারা শরীর তাঁর গান গেয়ে উঠল। দুহাত দিয়ে পার্বতীও তাঁকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। হারিয়ে গেলেন দু'জনে। তাপর যখন বিচ্ছিন্ন হলেন মুখেচোখে ফুটে উঠেছিল তৃপ্তির সুস্মিত চিহ্ন। মুখশ্রী সলজ্জ, আঁখি স্তিমিত।

পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ফটিক স্বচ্ছজলে মহাদেবের চুম্বনে পার্বতীর সিক্ত ওষ্ঠে জমাটি রক্তের যে নীলাভ ভাব ফুটে উঠেছিল তা স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ ধারায় বারংবার ধুতে ধুতে কালশিরে পড়া নীল দাগ একসময় মিলিয়ে গেল। স্রোতস্বিনীর জলধারা তাতে নীল হয়ে উঠল। তখন এর নাম হল নীলগঙ্গা। দুই তীরের পাহাড়, বন, ঝরনাকে চমকে দিয়ে, পাখিদের মুগ্ধ করা প্রেমের কাকলি নিয়ে নীলগঙ্গা আজও হরপার্বতীর অমরপ্রেমের মহিমা কীর্তন করতে করতে সবিরাম ধেয়ে চলেছে অনন্তের পানে।

পহেলগাঁওতে একরাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে বাবা অমরনাথজি জয়, ভোলে বাবা পার করে গা—বলতে বলতে টাটা সুমোয় উঠলাম। পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ির দূরত্ব পনেরো কিলোমিটার। এক ঘণ্টায় আমরা পৌঁছে গেলাম চন্দনবাড়ি। এখানে থেকে অমরনাথ গুহায় যাত্রা করতে হয়। এ হল গুহাতীর্থে যাওয়ার সিংহদ্বার। ভৃগুমুনিও হয়ত সুদূর অতীতে এই পথেই অমরনাথ গুহা দর্শন করেছিলেন। বিপদসংকুল দুর্গম পথ অতিক্রম করে, শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বৃষ্টি বাদল মাথায় করে শরীরপাত করে অমরনাথ যাওয়ার এই নেশার পেছনে কী রহস্য আছে জানি না। তবু কোন কিছু পরোয়া না করে তো কাতারে কাতারে দর্শনার্থী চলেছে। কিসের টানে, কেন যে যায় তা তারাই জানে।

আমায় যদি কেউ প্রশ্ন করে কিসের আকর্ষণে অমরনাথ যাচ্ছি তাহলে বলব, হিমালয়ের অভিনবত্বের লোভে। দুর্গম পথের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে একেবারে পাহাড়ের মধ্যিখানে বসে জীবন্ত পাহাড়ের শান্ত স্নিগ্ধ, ধ্যানসমাহিত রূপ দেখব, পাহাড়চূড়া আর এক চিরন্তন ভারতবর্ষের আত্মাকে অনুভব করব। চিরে চিরে অধ্যাত্ম ভারতবর্ষের পরমকে সব কিছুর মধ্যে আবিষ্কার করার নেশায় চলেছি। যা কিছু দুর্গম, দুরূহ তাকে করায়ত্ত করার প্রবল ইচ্ছে মাঝে মাঝে আমাকে জেদী করে! যা সহজে পাওয়া যায় তাতে আমার মন বাঁধা পড়ে না। তাই পাহাড়কে জয় করব বলেই একজন মারাত্মক ইসকেমিয়া পেশেন্ট হয়েও পথের ভয়ে থেমে থাকিনি। ডাক্তারের নিষেধ মানিনি। যাত্রার আগে নানা অজুহাত দেখিয়ে যাত্রা পণ্ড করতে চেয়েছি; কিন্তু সে শুধু গৃহিণীর জন্য। তার মধ্যে কোনো সত্যি ছিল না। তাই যাত্রা

যখন সত্যি করতে হল তখন যাত্রা শেষ করার কথা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মাথায় ছিল না। আমি চাই জয়। যে কোন মূল্যে সেই জয় ছিনিয়ে আনার সংকল্প আমার। জয় আমার লক্ষ্য। কোন পথে কিংবা কী উপায়ে জয়ী হলাম সেটা বড় কথা নয়। কারণ জয়ের পরে পথ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। জয়টাকেই সবাই মনে রাখবে। সব পথই লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ। বাবা অমরনাথের কাছে পৌঁছনোই একমাত্র সত্য। তাই স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে চড়াই রাস্তা পাড়ি দেওয়ার জন্য চন্দনবাড়ি থেকে একটা ঘোড়া নিলাম। আমার সঙ্গীরা হেঁটে যাবে বলে মনস্থ করল। মাল বওয়ার জন্য তারা একজন কুলি নিল। অতঃপর জয়বাবা অমরনাথজি কী জয় বলে, গুহাতীর্থের দেবতার নামে জয়ধ্বনি করে যাত্রা করলাম।

ঘোড়ায় চড়ার আগে শীতের পোশাক পরে নিলাম। বৃষ্টি প্রতিরোধে জন্য পলিথিনের শিট গায়ে জড়িয়ে নিলাম, যাতে বর্ষার জল আর ঠাণ্ডায় শরীরটা কাবু না হয়ে পড়ে। যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম। যাত্রা শুরু হল। মনে হল রাজ্য জয় করতে চলেছি।

আগে কখনও ঘোড়া চড়িনি। ঘোড়ার চড়ার কোনো বিলাসিতাও আমার নেই। তাই এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। পাছে পড়ে যাই, এই ভয়ে ঘোড়ার পিঠে কাঠ কাঠ হয়ে বসে আছি। সহজ হতে পারছি না। ঘোড়া একটু এধার ওধার করলেই সারা শরীরটা দাঁড়িপাল্লার মত একদিকে ঝুলে পড়ে। ভীষণ টাল খায়। মনে হয়, এই বুঝি পড়ে যাচ্ছি। ভয়ে ভয়ে ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে বলি বড় আশা করে এসেছি। তোর হাতে আমার জীবন মরণ। আমার জয়-পরাজয় সব তোর ওপর সঁপে দিলাম। দেখিস বাপু, আমাকে ডোবাস না। ফেলে দিয়ে হাড়-গোড় ভেঙে দিস না যেন। সহিস আমার কথা কী বুঝল কে জানে? হিন্দীতে বলল : মাদী ঘোড়া আছে বাপু। পুরুষ সওয়ারীকে পেয়ারী খুব খাতির করে। ডরো মাত বাবু। আবহাওয়া ভাল থাকলে আগামীকালই আমরা গুহা দর্শন করে পঞ্চতরণীতে ফিরে আসব।

সহিসের কথায় ভরসা হল। শিরদাঁড়া সিধে করে ঘোড়ার পিঠে টববগ করে চলেছি। একটুখানি যেতেই ইলশেগুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। তবু কোন যাত্রী থমকে পড়েনি। দাঁড়ানোর জায়গা কোথায়, যে একটু আশ্রয় নেবে? সেখানে চন্দনবাড়ির রাস্তার দু'ধারে দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসেছে। যাত্রীরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর যে যার মত কিনে নিল। বিশেষ করে যারা হেঁটে আসছিল তারা সবাই একটা করে লাঠি কিনল। খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠতে এর মত বন্ধু নেই। হাঁটার সময় সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়।

ভ্রমণ পিয়াসী মানুষের এই যাত্রা কবে থেকে শুরু হয়েছে কেউ জানে না। পিলপিল করে কত মানুষ চলেছে। কালো মাথায় ভরে গেছে চত্বরটা। দারুণ উৎসাহে সবাই হাঁটছে। কারও কোনও পিছুটান নেই। পিছনে তাকানোর সময় নেই। যে যার মত এগিয়ে চলেছে। কারও জন্য কারো প্রতীক্ষা নেই। এক অনন্ত চলার মধ্যে আমিও প্রবিষ্ট। থেকে থেকে জয় বাবা অমরনাথজি কী জয়। বাবা ভোলেনাথ কী জয়। ওই মহামন্ত্রধ্বনির দুর্দমনীয় আকর্ষণ যেন গভীর করে রক্তের কণায় কণায় মিশে যায়। ভোলাবাবা পার করে গা বলে অমরনাথ যেন ডাকছেন।

অমরনাথ যাত্রীরা বিশ্বাস করে গুহায় বসে শিব পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন। মনে মনে সেই অমরকথা স্মরণ করে যাত্রীরা অমরনাথে যাত্রা করে। সে কথা যে কানে শোনে কিংবা মনে মনে ধ্যান করে সেই অমর হয়ে যায়। বাস্তবে সে অমরত্ব কোথাও না থাকলেও ভক্তের হৃদয়ে শিব-শিবানীর অমর কথার গল্প অমর হয়ে আছে। যুগ যুগ ধরে যাত্রীরা চলতে চলতে একজন অন্যজনকে সে গল্প শোনায়। হিমালয়ের হিমেল হাওয়ার প্রাণপ্রাচুর্যে দেহ মন এমনিতে এত চাঙ্গা হয়ে থাকে যে মাইলের পর মাইল হাঁটলেও ক্লান্তি লাগে না। বরং এক অদ্ভুত আনন্দে জীবনটা নতুন করে প্রাণ পায়। অমর কথা গল্প যাত্রীদের প্রাণমনকে নবীকৃত করে। এরই নাম অমরত্বের অনুভূতি।

চন্দনবাড়ির পথ ফুরিয়ে গেল। সামনে খাড়াই পাহাড় বুক ফুলিয়ে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে। অমরনাথ যাত্রার প্রথম দ্বারপাল। এখানকার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই অমরনাথ গুহার যাত্রার ছাড়পত্র পাবে। এই সেই বিখ্যাত পিসু পাহাড়। যার নাম শুনে যাত্রীরা আঁৎকে ওঠে। একেবারে খাড়া পাহাড়। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা শুধু নয়, বড় বড় পাথর যাওয়ায় পথ আগলে যাত্রীদের সঙ্গে মজা করছে যেন। বৃষ্টিতে ভিজে শ্যাওলা ধরা পাথরগুলো কাদায় পিছল হয়ে আছে। একটু অসাবধান হলে পা হড়কিয়ে একেবারে নিচে পড়তে হবে। এঁকে বেঁকে সরু রাস্তা ধরে উপরে উঠতে ঠাণ্ডার মধ্যেও গলদঘর্ম হতে হয়। ওপরের দিকে কিংবা নিচের দিকে তাকালে দেখা যাবে পিঁপড়ের সারির মতন কালো মাথার সারি। বলতে গেলে রাস্তা বলে কিছু নেই। জিগজ্যাগ করে অর্থাৎ জেডের মত হয়ে রাস্তা ওপর দিকে উঠছে। এভাবে দেড় হাজার ফুট উঁচু আর সাড়ে তিন মাইল রাস্তা যেতে হবে। এরাস্তায় ঘোড়ায় যাওয়া বিপজ্জনক। পাছে পা পিছলে যায় তাই পাথরের ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে ঘোড়া খুব সন্তর্পণে লাফিয়ে ওঠে। ফলে কখনও সামনের দিকে কখনও পিছনের দিকে দেহটা ঝুলে পড়ে, কাত হয়ে যায়। মনে হয় এই বুঝি উল্টে গেলাম। অনেক সময়

উল্টে যায়ও। ঘোড়া থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙে. ভালরকম আহত হয়ে অমরনাথ না গিয়ে তাদের ঘরে ফিরতে হয়। ঘোড়ার যাওয়া আনন্দের না হয়ে যন্ত্রণার হয়ে ওঠে। প্রতিমুহূর্ত দুর্ঘটনার আতঙ্ক নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা জিনটিকে সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে থাকতে হয়। হাতের মুঠি একটুও আলগা হওয়ার উপায় নেই। মুঠি শিথিল হওয়া মানে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে যাওয়া। তাই যাঁরা ঘোড়া চড়ে যান তাঁরা শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা নিয়ে জেরে জোরে বাবা অমরনাথের নাম স্মরণ করতে করতে ওপরে ওঠেন। দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামছি গল গল করে। ঘাম ঝরছে। ঘোড়ার সহিস মহিমকে জিগ্যেস করলাম পিসু টপ নাম হল কেন ভাই? পিসু মানে কি? প্রত্যুত্তরে সহিস বলল কাশ্মীরী ভাষায় পিসু মানে পিছল। এই পথ অত্যন্ত চড়াই এবং শিলাময় বলে প্রতিমুহূর্ত পিছলে পড়ার সম্ভাবনা। তাই পিছলে পড়ার জন্য লোকে একে পিসু ঘাঁটি বলে।

আহা রে! কষ্টসহিষ্ণু পাহাড়ী ঘোড়াও হাঁফিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে একটু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। সহিসের তাড়া খেয়ে আবার চলছে। কখনও হাঁটতে হাঁটতে মুখ থেকে একটা আওয়াজ বের করছে। বেশ বোঝা যায় সে আওয়াজ কষ্টের আর বিরক্তির।

সর্বাপেক্ষা উঁচু চড়াই পথ পার হচ্ছি। পথটা শুধু সংকটসংকুল নয়, অত্যন্ত ·সংকীর্ণ এবং অপরিসর। একজন পথচলতি যাত্রীকেও ওভারটেক করার রাস্তা দেওয়া যায় না। নড়বার জায়গা নেই। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে পাহাড়ের ঢাল এবং বড় বড় পাথর সমস্ত পথ জুড়ে ছড়ানো। এ পথেই যাত্রীদের ওঠা এবং নামা। মানুষের সঙ্গে চতুষ্পদ জন্তু এবং পাল্কীর চার বেহারাও যাতায়াত করছে। এমন সংকটসংকুল দুরতিক্রম্য পথে পায়ে হাঁটাও বিপজ্জনক। বলতে কি কণ্ঠ, তালু টাগরা সব শুকিয়ে গেছে আমার।

হঠাৎ চেপে বৃষ্টি নামল। কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই। একটা গাছও নেই যে তার নিচে দাঁড়িয়ে একটু আশ্রয় নেব। সব সময় বৃষ্টি হচ্ছে। কখনও ঝির ঝির করে, কখনও জোরে। বাধ্য হয়েই ভিজে ভিজে যেতে হয়। পলিথিনের চাদর আর ওয়াটার প্রুফের জ্যাকেট একমাত্র ভরসা। তবু সকলের সঙ্গে মিলে বৃষ্টিতে ভিজে কর্দমাক্ত পথে যেতে মন্দ লাগছিল না। বারংবার মনে হচ্ছিল, এইভাবেই তো যুগ যুগ ধরে যাত্রীরা অমরনাথ দর্শন করছে। আমিও তাদের মত ঐ পথে চলেছি। আবার এই পথেই অমরনাথের তুষারলিঙ্গ দর্শন করে ফিরব। পথই পথিকের একমাত্র সম্বল। আশ্রয় যা পাওয়া ঐ পথের কাছেই পেতে হয়। পথের ভাবনা তো আর এখন আমার

নয়। তাঁর কাছে আমায় যিনি নিয়ে যাচ্ছেন সব দায়িত্ব এখন তাঁরই। তিনি চাইলেই তবে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারা যায়। অতএব, গোটা পথের দুর্গতির কথা না ভেবে তাঁর কথাই ভাবা যাক।

ভাবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না। ঘোড়া চলেছে একেবারে খাদের ধার ঘেঁসে। ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। অত্যন্ত চড়াই পথ হওয়ায় সব সময় সামনের দিকে ঝুঁকে আছি। নইলে, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। ভরসা করে কোনোদিকে তাকাতে পারছি না। আমার তীক্ষ্ণ নজর ওর পায়ের দিকে। ইস্‌কেমিয়া পেসেন্ট বলে এত চড়াই পথ পায়ে হেঁটে উঠতে সাহস হয়নি। অনেকখানি একটানা ওঠার পরে মহিমকে ঘোড়া দাঁড় করতে বললাম। এ জায়গাটা মোটামুটি প্রশস্ত। ঘোড়া থেকে নেমে বিশ্রাম নেবার জন্য একটি বড় পাথরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখছি জেডের মত পথে নানা রঙের পোশাকে নানা দেশের নানা ভাষার মানুষ। মনে হচ্ছে ভক্ত যাত্রীরা একটা বিরাট মালা হয়ে ধূর্জটির গলায় শোভা পাচ্ছে। হঠাৎই মনের অতল থেকে উঠে এল এক সুদূর অতীত।

তখন পৃথিবীতে দেবতা ও অসুররাই শুধু বাস করত। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। দু'জনের কেউ কাউকে সহ্য করতে পারত না। যুদ্ধের জয়-পরাজয় দিয়ে সব বিবাদ বিরোধের নিষ্পত্তি হত। একবার এই পথে অমরনাথে যাওয়া নিয়ে তাদের বিবাদ শুরু হয়। কে আগে পিসু টপে উঠবে বিরোধটা সেই নিয়ে। চতুর দেবতারা আগে ভাগে ওপরে গিয়ে ঘাঁটি করে বসল। অসুরদের অমরনাথের যাওয়ার রাস্তা আটকে দেওয়ার জন্য বড় বড় পাথর দিয়ে ব্যারিকেড করল। উপরে থাকার জন্য দেবতারা আক্রমণ প্রতিরোধের সুযোগ পেল বেশি। নিচে থাকার জন্য অসুরেরা দেবতাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। যেমন এবার হয়েছিল কার্গিল যুদ্ধে ভারতের অবস্থা। দেবতারা উপর থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে অসুরদের পিষে ফেলতে লাগল তারা। দেবতাদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে অনেক অসুর পিষ্ট হয়ে মারা গেল। সেজন্য এই জায়গার নাম হল পিষু ঘাঁটি।

সুপ্রাচীনকাল থেকে যে অমরনাথ যাত্রা প্রচলন ছিল এই গল্পটি তার দৃষ্টান্ত। যাই হোক, অবশেষে উদ্ধত, দুর্বিনীত পাহাড়কে আমাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের কাছে মাথা নোয়াতে হল। পিসু টপের পথের সব বাধা জয় করে সত্যি সত্যি উপরে উঠতে পারলাম। পিসু টপের মাথাটা সমতলভূমির মত। বিরাট প্রান্তরের মত জায়গায় শ্রী শিব সেবক সমিতি, দিল্লি শাখা তাঁবু খাটিয়ে ক্লান্ত বুভুক্ষু, যাত্রীদের জন্য বিনি

পয়সার ভোজের লঙ্গরখানা খুলেছিল। সচরাচর লঙ্গরখানা বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। বুফে ব্যবস্থা। নিজের ইচ্ছেমত, পছন্দমত, পরিমাপমত খাবার তুলে নাও। ঢালাও বন্দোবস্ত। কী নেই? যাবতীয় ড্রিঙ্কস (মদ বাদে) মিষ্টি, দই, লজেন্স, টফি, চানাচুর, বাদাম, বিস্কুট, ড্রাইফুডস ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে, ফ্রায়েড রাইস, খিচুড়ি, তন্দুরি, লুচি, পরটা, ধোসা, দই বড়া, রুটি নানারকমের সবজি কত নাম করব। পেট ভরে খাও আর পথের জন্য পকেট ভরে শুকনো খাবার নাও।

শালপাতার থালি ভরে নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে খাবার সময় বয়স্ক এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হল। অবশ্যই বাঙালি। দু'জনে দু'খানা পলিচেয়ারে বসে খাচ্ছি। আর টুকটাক গল্প করছি। এখন বৃষ্টি নেই। কিন্তু গোটা প্রান্তরটা বহু মানুষের পায়ে পায়ে কাদা হয়ে গেছে। এমন কি তাঁবুর নিচেও জল কাদা থিক থিক করছে। কথায় কথায় মহিলা বললেন, অমরনাথের অমরকথা শোনার মত নির্জন জায়গা এখন কোথাও নেই। তবু ভুলতে পারি না একদিন এই পথেই তিনি কৈলাসে গিয়েছিলেন পার্বতীর সঙ্গে। হয়তো তার পদরেণু এখনও পথের কাদায় মিশে আছে।

মহিলা সহসা প্রাণ পেল যেন। একজন অচেনা পুরুষের সঙ্গে উপযাচক হয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতে একটুও সংকোচ নেই। তাঁর দিকে পিট পিট করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম : তাহলে, খেতে খেতে সেই গল্পই বলুন। পথে পথে কত অমরকথা ছড়িয়ে আছে। যেতে যেতে তা শুনব বলেই তো এত পথশ্রম করে এখানে এসেছি। এসব গল্পের কালেকশান তৈরি না হলে আসাটাই মিথ্যে হয়ে যাবে। আপনি বলুন।

মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে এক অদ্ভুত সুন্দর গল্প। গল্প শুনতে শুনতে পার্বতীর মত আপনি আবার ঘুমিয়ে পড়বেন না তো। সেই সঙ্গে একগাল হাসি। কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, শিব ও শিবানীর শান্তির সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করতে কলহপ্রিয় দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব হল একদিন। শিবকে ঘরে দেখতে না পেয়ে নারদ একটা ফন্দী আঁটল। একথা সে কথা বলে গল্প জুড়লেন শিবানীর সঙ্গে। তারপরে বললেন, মাগো ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই কিন্তু অমরকথা শোনার সৌভাগ্য হল না আজও। হবে কোথা থেকে বল, তোমার পতিদেবতা তো একাই সেই গুপ্তজ্ঞান নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। কাউকে তার পুণ্যের ভাগ দিতে চান না। এমন কি তোমাকেও না। আজ পর্যন্ত তোমাকেও সে কাহিনী শোনানোর ফুরসত হয়নি। অথচ মনে মনে ভেবেছিলাম তোমার কাছেই গল্পটা শুনে নেব। কিন্তু তা আর হল না। মানে হওয়ার উপায় নেই। কারণ তুমিও তার বিন্দুবিসর্গ জান না।

পার্বতী সহজভাবে বলল তাই বুঝি। অমরকথা জানলে কী হয় দেবর্ষি?

আপনি অমর হয়ে যাবেন। অমর হতে কে না চায় বলুন।

আদ্যাশক্তি মহামায়া হয়েও সেকথা জানি না আমি. এতো ভারি আশ্চর্য! ভোলানাথ জেনেও আমায় গোপন করেছে, বলছ। এত স্বার্থপর কিন্তু সে নয়। তোমার কোন ভুল হচ্ছে না তো দেবর্ষি।

মার কাছে সন্তান মিথ্যে বলতে পারে?

শিবানীকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখাল। নারদ বুঝল, তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। পাছে পার্বতীর কাছে ধরা পড়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থানের জন্য বলল : মা-গো তোমার মনটা ভাল নেই। আজ তাহলে উঠি। ভোলানাথের কাছ থেকে সব কিছু জেনে নাও। একদিন সময় করে এসে জেনে যাব।

পার্বতী মানে শিবানী, তাকে বসতে বললেন না আর। নারদও পার্বতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন। শিব ঘরে ফিরলে পার্বতী তাঁকে বিশ্রামের সময় পর্যন্ত দিলেন না। অনুযোগ করে বললেন : আমাকে একটুও ভালবাস না তুমি। আমার কাছে যে কিছু গোপন করতে পার তুমি নারদ না বললে কোনদিনই জানতে পারতাম না।

শিবের ভুরু কুঞ্চিত হল। বললেন : নারদ এখানে এসেছিল বুঝি? নারদের আগমন সংবাদ শুনে শিব মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। অশান্তির জন্য যা করা দরকার নারদ তা করেই বসেছে। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। তাই নারদকে ডেকে সালিশ না করে আপসে পার্বতীর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নেয়ার জন্য শান্তভাবে বললেন : নারদ তোমাকে কী বলেছে জানি না। কিন্তু তোমার কাছে আমার গোপনের কিছু নেই।

পার্বতী শিবের বুকের খুব কাছে এসে দু'হাতে গলা জড়িয়ে আব্দার করে বললেন : তা হলে আমার গা ছুঁয়ে তিন সত্যি কর। বল, অমর কথা বলবে। কিছু লুকোবে না।

শিব শপথ করলেন। পার্বতী বললেন : অনন্ত সৃষ্টির মূল রহস্যের কথা তুমি জান। সেই অমর কথা শোনাও আমাকে। আমিও অমর হব।

শিব মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। এই অবুঝ মহিলাকে কোনভাবে বাগে আনা যাবে না শিব তা জানে। তাই অনিচ্ছাটাকে গোপন করার জন্য বললেন : এই কথা! আমি ভাবি কি না কি? তোমার ভাল লাগবে না ভেবে বলার উৎসাহ পাইনি। তবু যদি একান্ত শুনতে চাও, তাহলে বলব। তবে হাঁ, ও কথা যেখানে সেখানে বলার নয়। গুপ্ত কথা তো, সেজন্য গুপ্ত জায়গা চাই। গুপ্তস্থানে বসেই সে কথা শুনতে হয়।

পার্বতী শিবের গলা থেকে হাত নামিয়ে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অনুযোগ করে বললেন : সে জায়গা খুঁজতে তোমার যে কতকাল লাগবে কে জানে? আসলে তোমার বলার ইচ্ছে নেই। তাই অজুহাত খুঁজছ। আমাকে বোকা পেয়ে যা হোক একটা বুঝিয়ে দিলে।

শিব বিব্রত হয়ে বললেন : তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সেরকম জায়গা অবশ্যই হিমালয়ে আছে।

কোথায়?

সে এক অপরূপ গুহা। কাকপক্ষীও তার খবর রাখে না। কেবল আমি জানি। সেখানে বসে তোমাকে অমরকথা শোনাব। পরিত্যক্ত নির্জন গুহা থেকে আমার কথা অন্য কেউ শুনতে পাবে না।

পার্বতী খুশি হলেন। স্বামীর বুকের ওপর মাথা রেখে বললেন, তুমি খুব ভাল।

শিব স্ত্রীকে খুশি করার জন্য বললেন : আমার কথা শোনার পরে একবার বাপের বাড়িও বেড়িয়ে আসতে পারবে। একসঙ্গে রথ দেখা, কলা বেচা দুই হবে।

তারপর, সুখী দম্পতিদ্বয় সেই অপরূপ গুহা গৃহে পৌছলেন। একটা সুন্দর জায়গা নির্বাচন করে দু'জনে মুখোমুখি বসলেন। পার্বতী শিবের কোলে মাথা রেখে ভাল করে শুলেন। চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন : এবার বল।

শিব হেসে বললেন : লম্বা চওড়া গল্প। অনেক সময় লাগবে। ঘুমিয়ে পড় না যেন। ঘুমোতে দেখলেই কিন্তু আমি গল্প বলা বন্ধ করব।

তোমার মুখের দিকে প্যাটপ্যাট করে সর্বক্ষণ চেয়ে আছি। ঘুমিয়ে পড়লে তো দেখতে পাবে। তখন জাগিয়ে দেবে।

উঁহু তা হবার উপায় নেই। আমি চোখ বন্ধ করে ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে গল্প বলব। যোগস্থ হয়েই তবে সে গল্প বলা যায়। তাই, মাঝে মাঝে হুঁ-হুঁ করে তোমাকে জানাতে হবে যে তুমি জেগে আছ। তোমার সাড়া না পেলে আমি গল্প বলা বন্ধ করব।

পার্বতী রাজি হয়ে গেলেন। বললেন : তাই হবে।

শিব তার গল্প আরম্ভ করল। ভূমিকা করার জন্য মজা করে বললেন : কমলালেবুর খোসাটা ছাড়িয়ে ভিতরের মিষ্টি কোয়াটা আমার থালায় সাজিয়ে দিচ্ছ। কলার খোসাটা পাশে রেখে দুধের বাটিতে কলাটা দিচ্ছ। এখন যদি জিগ্যেস করা হয় ফলের বাইরে খোসাটা বাদ দিচ্ছ কেন? খোসার ভিতরে শাঁসকে খাদ্য ভাবছ কেন? জবাবে বলবে খোসাটা হল অসার আর তার ভিতরের শাঁসটা হল সার। এ হল জ্ঞানের খেলা। দর্শনের পরিভাষায় বিদ্যা ও অবিদ্যা। দুইয়ে মিলে এক। তবু পরিচয়

নেবার সময় দুটোকে আলাদা করে দেখতে হয়। তাহলে পূর্ণ কাকে বলবে? মিথ্যা পোশাক পরা যে সত্য তাই হল মায়া। বিদ্যা ও অবিদ্যার মিলনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করে জীবন অমৃতের সন্ধান পায়। বিদ্যা-অবিদ্যা, সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে এক করে বিশ্বাসের রসে রসিয়ে নিতে হবে। তাই তো সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে পুরাণের পাতায় সত্যমিথ্যায় ভরা কত গল্প, কত ব্রহ্মাণ্ড, কত সৃষ্টি, কত প্রলয়ের কথা গল্পে গল্পে এগিয়েছে। এই সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য বোঝা সহজ কাজ নয়। না বুঝলে, সবই ধোঁয়াটে হয়ে থাকবে। আবার বুঝতে পারলেও প্রজ্ঞা বা বিশ্বাস না থাকলে তা গাঁজা মনে হতে পারে। চেতনালব্ধ সত্যকেই ঋষিরা ব্রহ্ম বলেছেন। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহত্তম। দেশগত, কালগত, গুণগত সত্তাগত ও অবস্থাগত যে কোন সীমা, পরিধি, কল্পনা যেখানে শেষ হয়ে যায় তার পরের অবস্থাটি ব্রহ্ম।

বলতে বলতে শিব যোগস্থ হয়ে গেলেন। সুদূরলোক থেকে কথাগুলো আহরণ করে এনে যেন শিব বলতে লাগলেন : ব্রহ্মই এ বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ—ব্রহ্মই বরণীয়। জ্ঞান ছাড়া তাকে জানা যায় না। তাই যেই জ্ঞান এলো, বিশ্বের জীব সবই শিবময় হল। ব্রহ্ম হল পরম পুরুষের এক অংশ। তা থেকেই সব উৎপত্তি, আবার তাতেই সব লয়। তখন সে জানল "অহং ব্রহ্মোস্মি"। জীবের মধ্যে ব্রহ্মের অভিন্নরূপ চেতনাতে আসামাত্র জীব বলতে পারল "তত্ত্বমাসি"— তুমিও সেই ব্রহ্ম গো। তুমি আমি নিখিল বিশ্ব। এমন কি ওই সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সব ব্রহ্ম। ব্রহ্মময় এই জগৎ সত্য। জ্ঞানও অনন্ত। শুধু তাই নয় সে রসময়ও বটে— রসো বৈ সঃ। ব্রহ্ম যে, তিনি অনন্তও নন, জ্ঞানময়ও নন, সত্যপূর্ণও নন, রসপূর্ণ। তোমাকে নইলে হে ত্রিভুবনেশ্বর আমার প্রেম হত যে মিছে। এরই নাম অমরকথা।

কঠিন তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে পার্বতী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন ওই গুহায় যে শুকপাখিটি বাস করত সে শিব-শিবানীর সব কথা শুনছিল। পাছে শিব অমরকথা বলা বন্ধ করে তাই শুকপাখিটি পার্বতীর স্বর নকল করে সামনে হুঁ হুঁ করে গেল। আর শিবও একের পর এক গল্প বলতে লাগল।

শিব বলছিল পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় অসংখ্য নর-নারীকে স্নান করতে দেখে তুমি প্রশ্ন করলে গঙ্গায় রোজ স্নান করে কত পাপী তাপী উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে। তা হলে তো পৃথিবীতে আর কেউ পাপী থাকবে না। সেদিন পৃথিবী কি স্বর্গ হয়ে যাবে!

পার্বতীর কথা শুনে মহাদেব হেসে বললেন : চল, আমরা ওই গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দুই বুড়ো বুড়ি হয়ে বসি। স্নান করে যে লোক উঠে আসবে তাকে বলবে, যে কখনও পাপ করেনি কিংবা যার কোন পাপ নেই এমন লোকের হাতে এক গণ্ডুষ জল পেলে

আমার স্বামী ভালো হয়ে ওঠবে।

মহাদেবের কথা শুনে পার্বতী তাই করল। কিন্তু এক গণ্ডুষ জল দেবার একজন লোকও পাওয়া গেল না। পার্বতী খুব হতাশ হলেন। উঠব উঠব করছিলেন, এমন সময় একজন মাতাল টলতে টলতে স্নানে আসছে। পার্বতী তাকে বললেন : যদি পাপ না থাকে বাবা, আমার কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত স্বামীকে ভালো করে দাও। তোমার এক গণ্ডুষ জল পেলে ওর সব কুষ্ঠ সেরে যাবে। মাতাল পার্বতীর দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে বলল : একটুখানি সবুর কর মা! গঙ্গায় দুটো ডুব দিলে আর পাপ থাকবে না। আমার জল পেলে তোমার স্বামী নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে।

পার্বতী বললেন : বাছা মন পাপমুক্ত না হলে এই রোগ তোমার হবে। লোকটি একগাল হেসে বলল : মা, তুমি নিশ্চিন্তে থাক। পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গায় ডুব দিলে আর কোনো পাপ থাকে না।

মহাদেব তখন বলল : দেখলে তো, হাজার হাজার লোকের মধ্যে শুধু একজনই বিশ্বাস করে গঙ্গায় স্নান করলে পাপ থাকে না। সরল বিশ্বাস, প্রগাঢ় ভক্তি এবং গভীর শ্রদ্ধা ছাড়া কোন কিছু অর্জন করা যায় না। এরই নাম অমরকথা।

মহাদেব না থেমে আর একটা গল্প শুরু করলেন। একবার এক ভক্তকে দেখে তোমার খুব কষ্ট হল। তার দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য আমার শরণাপন্ন হলে। আমি বললাম, দয়া করুণা অনুগ্রহ নেওয়ার ক্ষমতা সকলের থাকে না। আমি ভাল চাইলেও ও কিন্তু ওর ভাল চায় না। মানে এর চাওয়াটা আন্তরিক নয়। ওর বিশ্বাসটাই মরে গেছে। ও শুধু অভ্যেসের বশে চেয়ে যায়।

পার্বতী রাগ করে বললেন : তোমার একটু করুণা পেলে ওর অবস্থা ভাল হয়ে যায়।

মহাদেবের অধরে অদ্ভুত হাসি ফুটল। বললেন : তোমার নিজের চোখেই তা হলে দেখ। ওই বোধ হয় তোমার ভক্ত আসছে। দ্যাখ সারা পথে কী যেন খুঁজছে। ওর সামনে এই স্বর্ণমুদ্রাটি ছুঁড়ে দিচ্ছি। এটি পেলে ওর দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। তখন একটা স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে দিল ভক্তের দিকে।

পার্বতী অবাক হয়ে দেখল ওই মুহূর্তে ভক্তটি চোখ বন্ধ করল। মুদ্রাটি ঝনাৎ করে তার সামনে পড়ল। তার পা স্পর্শ করে গড়িয়ে গেল তবু চোখ মেলে দেখল না। পা দিয়ে মাড়িয়েই চলে গেল। তখন মহাদেব বললেন, নিজের চোখে দেখলে তো। পারলে, ভক্তের কপাল ফেরাতে। শুভক্ষণ যখন আচম্বিতে আসে তখন চোখ বুজিয়ে থাকে ওরা। এ হল আর এক জীবনসত্য।

এই কথাগুলো সবিস্তারে শোনাতে দিন রাত শেষ হয়ে গেল। অমর কাহিনী শোনানো শেষ হলে মহাদেব দেখলেন, পার্বতী তাঁর কোলে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তার নাক ডাকছে। তা হলে পার্বতীর গলায় সর্বক্ষণ হুঁ হুঁ করে সাড়া দিল কে? কার স্বর তিনি শুনেছেন? ভুল শুনেছেন বলে মনে হল না। তাহলে কে শঠতা করল তাঁর সঙ্গে? সন্ধানী চোখ মেলে চতুর্দিকে খুঁজতে লাগলেন সেই তৃতীয় প্রাণীকে যে সর্বক্ষণ তাঁর কথায় সায় দিয়ে গেছে। অবশেষে আধ অন্ধকার গুহার এক কোণে এক শুকপাখিকে জড়সড় হয়ে বসে থাকতে দেখলেন। অমনি ক্রুদ্ধ হয়ে মহাদেব তাকে লক্ষ্য করে ত্রিশূল নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তার আগেই শুকপাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল আকাশে। অন্তহীন নীল আকাশে ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যেতে লাগল।

যোগবলে মহাদেব জানতে পারলেন এই শুক গোলকের লীলাশুক। রাধা-কৃষ্ণ মর্তে অবতীর্ণ হওয়ার পরে বিরহে তার দিন কাটে। তাই তাঁদের উভয়কে খুঁজতে বেরিয়ে পাহাড় বন, নদী, প্রান্তর দিয়ে উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে এই গুহায় বসে রাতটা বিশ্রাম করছিল। রাধা-কৃষ্ণের মত আর এক প্রেমিক-প্রেমিকা হর-পার্বতীর সাক্ষাৎ পেয়ে সেও পার্বতীর সঙ্গে অমরকথা শুনছিল। পার্বতী নিদ্রা যাচ্ছিল দেখে শুক তাঁর ভূমিকা নিয়ে সব কথায় সাড়া দিয়ে গেল। সুতরাং শিবের আর সাধ্য নেই তাকে মারার। তবু শিব তার পিছনে ধাওয়া করলেন। সরস্বতী নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় শুক দেখল ব্যাসদেবের স্ত্রী বটিকাদেবী স্নান করছে। ডুব দিয়ে জল থেকে মাথা তুলে হাঁ করে যেই শ্বাস নিতে গেলে প্রাণভয়ে শুক তক্ষুণি তার মুখ গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করল এবং সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে বটিকাদেবীর গর্ভে প্রবেশ করল। শিব হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে। শুকের বুদ্ধিতে চমৎকৃত হয়ে হার মানলেন।

পরমভক্ত বটিকাদেবী শিবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন আমি কি করব দেবাদিদেব?

মহাদেব ভক্তকে আশীর্বাদ করে বললেন, শুক তোমার পুত্র হয়ে জন্মাবে। জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞানী হবে। জগৎবাসীকে সে ভাগবত তত্ত্বরস শুনিয়ে মোহিত করবে। আর যে গুহায় বসে সে অমরকথা শুনল সেটি অমরতীর্থ অমরনাথ হয়ে ধরাতলে বিরাজ করবে। যারা এই গুহা দর্শন করবে তারাও শুকের মত পুণ্য অর্জন করবে। আমরা মোক্ষাভিলাষী কি না জানি না, তবে সেই অমরতীর্থে চলেছি। তুষারলিঙ্গরূপী শাশ্বত, সুন্দর ও মঙ্গলময় সেই মহেশ্বরকে প্রণাম।

গল্প শেষ হলে, মহিলা বললেন, আর নয়। সন্ধের মধ্যে শেষনাগে পৌঁছতে হবে।

রাতটা তো আজ সেখানে কাটাতে হবে। শেষনাগে সন্ধ্যা নামে কোলকাতায় যখন রাত আটটা। ঘোড়ায় যেতে যেতে টেনিসনের লাস্টরাইড টোগেদারের কথা মনে হল। পার্থক্য শুধু আমরা পাশাপাশি নয় একসঙ্গে চলেছি। কারণ অপরিসর সংকীর্ণ পথে পাশাপাশি চলার মত যথেষ্ট জায়গা ছিল না। তাই আগে পিছে যাচ্ছি। পথের শেষ নেই। যেতে যেতে আমার সহযাত্রিণী বললেন অমরনাথ যাত্রাপথের দুর্গমতার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর যদি কিছু হয় তা এই কাদা। এরকম পুরু এঁটেল কাদা যে এত উঁচু পাহাড়ে থাকে ভাবতে পারিনি। যারা হেঁটে যাচ্ছে এই ঠাণ্ডার মধ্যেও গলদঘর্ম হচ্ছে তারা। ঘোড়া পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আমার ঘোড়া তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আপনারটা বেশ তাজা আছে।

রসিকতা করে বললাম : আমার ছুঁড়ি ঘোড়া তো, তাই পুরুষ মানুষ পেয়ে প্রাণের খুশিতে টগবগ করে চলেছে, একটা আলাদা এনথু পাচ্ছে। আপনার ঘোড়া তো সেমসেক্সের তাই সওয়ারী বইতে ক্লান্তি বোধ করছে। ও যদি পুরুষ ঘোড়া হতো তা হলে দেখতেন আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে যেত।

মহিলা বললেন : ধ্যাৎ। আপনার যতসব আজেবাজে কথা। ঘোড়ার ওসব বোধ বুদ্ধি, অনুভূতি নেই।

ম্যাডাম, এটা খুব ভুল ধারণা। ইনস্টিংক্ট দিয়ে পুরুষ-নারী পরস্পরকে চিনে নেয়; বোধ বুদ্ধি হয়নি এমন শিশুও ইনস্টিংক্ট দিয়ে অপোজিট সেক্সকে চিনে নেয়। সেক্সপিয়রের টেমপেস্ট নাটকের কথা ভাবুন। মনুষ্যবর্জিত দ্বীপে মিরান্ডা পিতা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পুরুষ দেখেনি। ফার্ডিন্যান্ড-এর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তাকে সঙ্গীরূপে পেতে চাইল মিরান্ডা। তার সঙ্গ ভাল লাগল। সেক্সই তাকে চিনিয়ে দিল। এই বোধ তার মধ্যে সুপ্ত ছিল কেবল। আপনার সহিসকে জিগ্যেস করে কথাটা যাচাই করে নিতে পারেন। এই যে বিশ্বপ্রকৃতি সেখানেও "পুরুষ ও প্রকৃতরূপে তুমি সূক্ষ্মস্থূল, কে বোঝে তোমার তত্ত্ব, তুমি বিশ্বমূল।" সভ্যতা উন্নয়ন, অগ্রগতি বিস্তার সব কিছুর মূলে আছে সেক্স। এমন কি পূজার্চনায় আমরা সেক্সকে ভজনা করি। পূজা করার কোসা-কুসি, শাঁখ, বেলপাতা, পান-সুপারি সব কিছুই মানুষের জীবন থেকে নেওয়া সেক্স ভাবনা।

এভাবে খোলাখুলি কথা বলতে মহিলা বোধ হয় সংকোচ বোধ করছিলেন। স্বভাবতই তিনি একটু আড়ষ্ট। একটু ইতস্তত করে পথ চলতি কথা প্রসঙ্গর মুডটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এখন অনেক উঁচুতে, তাই না? রাস্তা ক্রমে দুর্গম এবং বিপদসংকুল হচ্ছে। গাছের চিহ্ন

নেই, পাখিও দেখা যাচ্ছে না। চোখজোড়া ঘোড়ার চরণ ছুঁয়ে আছে সর্বক্ষণ। তার চতুষ্পদই একমাত্র দেখার বিষয়। ঘোড়া নিয়ে যে কী ভুল করেছি তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছের অবস্থা। ছেড়ে তো যখন তখন দেয়া যায়। কিন্তু তাকে ছাড়া গুহায় পৌঁছব কী করে?

এখন মনে যে প্রতিক্রিয়াই হোক না কেন জেনে-শুনে আমি বিষ করেছি পান। কারণ, অমৃতের উৎস সন্ধানে পৌঁছতে হলে ওই চারপেয়ে জন্তুটির সহায়তা ছাড়া এভাবে পাহাড় দাপিয়ে বেড়ানো আমার দ্বারা হতো না। এই দুর্গম পাহাড় দেশে এই প্রাণীটির চেয়ে উপকারী বন্ধু আমার কেউ নেই। অমরনাথ যাওয়ার কোন পুণ্য যদি অর্জন করি তা হলে তার অর্ধেক পুণ্য এই ঘোড়ার প্রাপ্য। মনে মনে প্রার্থনা করি এই ঘুড়ি মরে যেন মনুষ্য জন্মলাভ করে।

মহিলা খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললেন, আপনি পারেনও বটে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। অমরনাথ দর্শনে বাকি অর্ধেক পুণ্য তো আপনার সহিসের প্রাপ্য। ভাগ-বাটোয়ারা করার পরে আর তো কিছু থাকে না। আপনার ভাগ্যে পুণ্যফল কিন্তু নিট জিরো।

হো-হো করে হেসে উঠি অকারণ। বললাম : আপনার কথাটা ভীষণ সত্য। আমার তাতে দুঃখও নেই। পুণ্যের আমার দরকার নেই। আমি চাই পূর্ণতা। যাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারার আশীর্বাদ। অমরনাথ দর্শনের পর আমার আর কিছু চাওয়া নেই। গন্তব্যে পৌঁছে গেলে চাওয়ার কিছু থাকেও না। ভাবুন তো আমাদের মুসলমান সহিসেরা প্রতিবছর কতবার অমরনাথ যায়, কিন্তু চায় না কিছু। এরা মুসলমান হলেও অমরনাথের কৃপা ও করুণার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। অমরনাথের এই দয়াটুকু আছে বলেই ওরা বেঁচে আছে। এক সিজনের কামাই নিয়ে সারা বছর চালায়। কোনোক্রমে এই যাত্রাটা পণ্ড হলে ওদের দুর্দশাটা কী হবে ভাবুন তো। যাত্রীদের সেবা করেই ওরা কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে, অভাবের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। তিনি না থাকলে, কে ওদের রক্ষা করত? অমরনাথ এই পাহাড়ী মানুষদের সুদূরকাল থেকে রক্ষা করে আসছে। একটা সুন্দর গল্প আছে তার। আপনি হয়ত সে গল্প জানেন। তবু অমরনাথের পথে এই গল্পগুলো একটা আলাদা মাত্রা পায়। কেন পায়, সে কথায় পরে আসছি।

মুসলিম মেষপালকের নাম বুটা মালিক। ছাগল ভেড়া চড়াতে বেরোয় রোজ। তৃণভূমির সন্ধানে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ঘোরে। গোটা পাহাড়ভূমি তার নখদর্পণে। তবু এই মেষের পাল চরাতে বেরিয়ে রোজই নিত্যনতুন জায়গা আবিষ্কার

করে। প্রকৃতির নিত্যনতুন রূপ দেখে ভেতরটা তার এক অনাবিল আনন্দে ভরে যায়। যতদূর দৃষ্টি যায় একটা উদাসীন অধ্যাত্ম শান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মুগ্ধ দুই চোখের পাতায় নেমে আসে অপার শান্তি। ধ্যানস্থ বুদ্ধের অধরে প্রসন্ন স্মিতহাস্যের মত ওর মুখমণ্ডলও পরম তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বুটা মালিকের সঙ্গে একদিন এক সাধুর দেখা হয়ে গেল। মালিককে দেখে সাধুর বিস্ময়ের সীমা নেই। গৃহী হওয়া সত্ত্বেও বুটার কোনও লোভ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, বাসনা, কামনা নেই। এমন কি ক্ষুধাক্লিষ্ট হয়েও কোনো অভিযোগ করে না। মেষ চরিয়ে যেটুকু অর্থ পায় তাতেই খুশি সে। এইটুকুই তার নিজের প্রাপ্য বলে ভাবে। ঈশ্বর এটুকুই তার জন্য বরাদ্দ করেছে। এর বেশি চাইলে সে পাবে কেন?

বুটার কথা শুনে সাধুর দয়া হল। একবস্তা কয়লা দিল তাকে। বুটা সাধুর দান মাথায় করে ঘরে ফিরল। বাড়িতে এসে বস্তার ভেতর আবিষ্কার করল রাশি রাশি সোনা। এত সোনা সে জীবনে দেখেনি। আনন্দে-উত্তেজনায় নৃত্য করতে লাগল। প্রাথমিক উন্মাদনা কেটে যাওয়ার পরে মোহর ভরা বস্তা মাথায় করে সাধুর কাছে ফিরে এল সে। বলল : কয়লা বলে যা দিলে সে তো বস্তাভরা মোহর গো! এত মোহর কোথায় পেলে তুমি?

সাধু নির্বিকার চিত্তে বলল : এ মোহর তোমার। তিনিই আমার হাত দিয়ে তোমায় দিয়েছেন। ওই বস্তা রাস্তায় পেয়েছিলাম। আমি সাধু মানুষ। ও সব নিয়ে আমি কী করব। দেখলাম, তোমার বড় অভাব, তবু হাত পেতে ঈশ্বরের কাছে কিচ্ছু চাও না। ফ্যাল ফ্যাল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক। তোমার কাজে লাগতে পারে ভেবেই বস্তুটা তোমায় দিয়েছি। তোমার ভাগ্যে কয়লা যদি সোনা হয়ে যায় সে তো তোমার মহিমা। ঈশ্বরের যে করুণা পেয়ে তুমি ধন্য হয়ে গেছ সারাজীবন সব ত্যাগ করে পথে পথে ঘুরেও আমি তাঁকে পাইনি। অবশেষে, করুণা যখন পেলাম, চিনতে না পেরে তোমাকেই তা দিয়েছি। অথবা ঈশ্বরে পরীক্ষায় ঈশ্বর হেরে বসে আছে আমার কাছে। আমি যে নির্লোভী হতে পেরেছি এও তাঁর করুণা। এই পাহাড়ের পথে পথে তাঁর অপার করুণা ছড়ানো। ঈশ্বরের কৃপা যেখানে পেয়েছি চল আমরা সেখানে যাই।

বুটা মালিক এবং সাধু সে স্থানে এসে লতাপাতায় ঢাকা একটি গুহা দেখতে পেল। খুব সন্তর্পণে দু'জনে হাত ধরাধরি করে গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। কনকনে ঠাণ্ডা আর কেমন একটা স্যাঁত্‌সেঁতে ভাব। ভিজে থাকার জন্য ময়লা জমে ভেতরটা কাদায় পিছল হয়ে আছে। দু'পা যেতেই দেখল তুষারশুভ্র অমরনাথের লিঙ্গাকৃতি

রূপ। তার থেকে জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। গুহার গর্ভদেশ উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। মুসলমান মেষপালক আর ফকির ওই গুহা গর্ভে তুষারলিঙ্গ অমরনাথকে প্রথম দর্শন করল।

মহিলা বললেন : আমি কিন্তু শুনেছি ওই মেষ পালকের নাম আক্রামবাট মল্লিক। সে ছিল যাযাবর গুর্জর সম্প্রদায়ের লোক। মেষ এবং ছাগল চরাতে চরাতে একটি মেষকে দলের মধ্যে দেখতে না পেয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। কারণ মেষপালের মালিককে হারান মেষটি ফেরৎ দিতে না পারলে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে তাকে। এগুলো তার মেষ নয়। চরানোই তার কাজ এবং সে জন্য নামমাত্র মজুরী পায়। তাই মেষপালক অসহায়ের মত দুর্গম পাহাড়ে পাহাড়ে মেষটি খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হল অমরনাথের গুহায়। সেখানে মেষটিকে পেয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু অমরনাথের তুষার লিঙ্গের দর্শন পেয়েছিল। কার্যত একই কাহিনীর এপিঠ-ওপিঠ।

অমরনাথ গুহাগৃহ আবিষ্কারের আর একটা কিংবদন্তি তাহলে শুনুন। এটা একেবারে অন্যরকম। চন্দনবাড়ির কাছে চাষীদের খেত-খামার ছিল! সেই খেতে কাজ করে চাষী পরিবারের মেয়েরাও। সন্ধ্যা হওয়ার আগে ঝরনার জলে হাতমুখ ধুয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল। এক কিশোরী মেয়ে যে, মাঠে রয়ে গেল সে খেয়াল হল না কারও। মেয়েটি নিজের মনে গান গাইতে গাইতে ছাগল, গরু, ভেড়ার সঙ্গে অনেকদূর চলে গিয়েছিল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। প্রান্তরে একজনও জনপ্রাণীকে দেখতে পেল না। প্রান্তর মধ্যে সে একেবারে একা। তখন ভীষণ ভয় পেল। গরু, ছাগল, ভেড়ার পালকে সে তখন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ে অন্ধকার নিবিড় হয়ে এলো। মেয়েটি তখন একাই দৌড়োচ্ছিল। হঠাৎ তার পথ আগলে দাঁড়াল তিনচারজন ষণ্ডামার্কা মন্দলোক। তাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই উল্টো দিকে দৌড়তে লাগল।

চাঁদ উঠল আকাশে। বৃষ্টিও হয়ে গেছে একটু আগে। পথ পিছল। পা পিছলে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল। লোকগুলো তাকে ধরার জন্য তরতর করে ঢালু পথে নেমে এল। ঝটিতে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। উঁচু নিচু, এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু দস্যুরা পিছু ছাড়ল না। মেয়েটি সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে দৌড়চ্ছিল। একটানা দৌড়নোর ফলে তার পেটে ফিকের কষ্ট হতে লাগল। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। তার পা দুটো আর চলছিল না। যন্ত্রাণায় টনটন করছিল। প্রতিমুহূর্ত মনে হচ্ছিল এক্ষুণি বুঝি পড়ে যাবে। আর ওই রাক্ষসগুলি তক্ষুণি তাকে ছিন্নভিন্ন করবে। তাই জোর করেই সে দৌড়তে লাগল। হঠাৎ, একটা ছোট্ট

পাথর টুকরোর ওপর পা পড়তে দেহটা টলে গেল। লতাপাতার ঝোপ ভেদ করে নিচে গিয়ে পড়ল। আঘাতের ব্যথাটা একটু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনে একটা গুহা দেখতে পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। নিরাপদ জায়গা পেয়ে মেয়েটি মূর্ছা গেল। দস্যুরাও ততক্ষণ গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দেখল, মেয়েটি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। শিকারের গায়ে হাত দিতে গিয়ে দস্যুরা থমকে গেল। এক অদ্ভুত দর্শন পুরুষ এসে মেয়েটিকে আগলে দাঁড়াল। তাদের চোখের সামনে তাকে কোলে তুলে নিল। শিকার হাতছাড়া হতে দেখে লোকগুলো দলবদ্ধ হয়ে ওই পুরুষকে আক্রমণ করল। কিন্তু কী আশ্চর্য, লোকটি শিকার সহ তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তারা পরস্পর জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনায় তারা ভয় পেল। ভাবল, কোন ভূতের পাল্লায় পড়েছে। ভয়ে সেখানে থেকে দৌড় শুরু করল তারা।

ওদের গ্রামে ফিরতে ভোর হয়ে গেল। ওরা যে মেয়েটির পিছু ধাওয়া করেছিল, রাতে না ফেরার জন্য পাড়ার লোকেরা উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় এধার ওধার করছিল। দুষ্ট লোকগুলি গত রাতের কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হল। নিজেদের দোষ কবুল করল। এবং যা যা হয়েছিল অকপটে সব বলল। তারপর গ্রামবাসীকে নিয়ে গুহার উদ্দেশে রওনা হল। সেখানে মেয়েটিকে কোথাও দেখতে পেল না। নাম ধরে কত ডাকল। কোন সাড়া মিলল না। বনজঙ্গল সরিয়ে গুহায় ঢুকে দেখতে পেল জ্যোতির্ময় এক তুষারলিঙ্গ। কী জ্যোতি তার। সবাই মিলে প্রণাম করল তুষারলিঙ্গ মহারাজকে। দুষ্কৃতকারীরা তো কেঁদে ভাসাল। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পাড়া-পড়শীরা ঘরে ফিরল। লোকের মুখে মুখে সেই কথা রটে গেল।

বিজ্ঞজনেরা বললেন : উনি হলেন অমরনাথ। আমাদের মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে তাকে বুকে টেনে নিয়েছেন। মেয়েটি পুণ্যবলে তাঁর মধ্যে লীন হয়ে গেছে। যাঁর আশীর্বাদ ও করুণা নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিল, তাঁর কোলেই সে ফিরে গেল। সেই থেকে জনমানবহীন এই পাহাড় প্রদেশে অমরনাথের পুজো প্রচলন হল। বলাবাহুল্য সে দিনটাও ছিল শ্রাবণ পূর্ণিমা।

মহিলা বললেন : দারুণ! আগে এ গল্প শুনিনি, গল্পটি রোমহর্ষকও বটে।

বললাম : এই গল্পগুলোর কাছ থেকে সবচেয়ে বড় প্রাপ্য হল, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ও সদ্ভাব। সব গল্পেই এক মুসলমান মেষপালক আছে। হিন্দুর দেশ কাশ্মীরে মুসলমান শাসন সূচনা হওয়ার অব্যবহিত পরেই এই গল্পগুলির সূচনা হয়। এ'হল ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের গল্প। সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রথম যুগে ধর্মান্তরিত

মুসলমানেরা হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে বাস করত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানের মিষ্টি সম্পর্ক তখনও অটুট ছিল। হিন্দুতীর্থ অমরনাথের পুণ্য হিন্দুরা মুসলমানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিল। বিধর্মী মুসলমানের হাত ধরে হিন্দুরা অমরতীর্থ অমরনাথের তুষারলিঙ্গকে চিনল। অমরনাথ হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি। তাই মেষপালকের বংশধরেরা আজও যাত্রীদের প্রণামী থেকে এক চতুর্থাংশ অর্থ পেয়ে আসছে। জাতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির এত বড় সংহতির মঞ্চ অমরনাথ ছাড়া ভারতে আর কোথাও নেই। শৈবধর্মের উদারতা ও ব্যপ্তির গৌরব মহিমার সঙ্গে সহিষ্ণুতা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক আদর্শ সৃষ্টি হয়েছে কিংবদন্তির গল্পগুলিতে। ধর্ম নয়, মানব মহিমাই এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

ঘড়িতে তখন ৮টা (ইংরেজিতে ২০টা)। ক্লান্ত সন্ধ্যা নেমে আসছে শেষনাগের পাহাড় চূড়ায়। সেই সঙ্গে ঝড় জল ছিল। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে হু-হু করে। যাত্রীদের থাকার জন্য তাঁবুর পসরা সাজিয়ে রেখেছে ব্যবসায়ীরা। প্রত্যেক তাঁবুতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আলো নেই। টিম টিম করে হ্যারিকেন জ্বলছে। নিবিড় কালো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে শেষনাগের বিস্তীর্ণ উপত্যকা। রাতটা এখানকার তাঁবুতে কাটাতে হবে। খাট, লেপ, তোষক, বালিশ সবই আছে। কেবল প্যাচপেচে কাদার জন্যই গা ঘিনঘিন করে।

ভালো করে যাত্রী আসা এখনও শুরু হয়নি। দশ শয্যাবিশিষ্ট তাঁবুতে আপাতত একা। সঙ্গীদের পৌঁছতে দেরি হবে। কাজেই বিছানায় দেহ রেখে বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবছিল। কিন্তু শোব কি ? এতই ঠাণ্ডা যে মনে হচ্ছে, ঠাণ্ডা জলে ভেজানো লেপ। পলিপ্যাকে মোড়া কম্বলের অবস্থাও তথৈবচ। বাধ্য হয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম।

তাঁবুর পেছনে শেষনাগের নীল হ্রদ। জ্যোৎস্নাধোয়া পাহাড়ের হাতছানি উপেক্ষা করা কঠিন হল। বাইরে বেরিয়ে দেখি পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে রূপোলী জলধারা। আর তার নীচে মায়াবিনী হ্রদ। পান্নার মত নিস্তরঙ্গ সবুজ জল মুগ্ধ করে। মনে হল তারার মালা গলায় আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে যেন। দু চোখে তার সমর্পণের তন্ময়তা। তুষারশুভ্র পাহাড় যেন জ্যোৎস্নাসমুদ্রে ভাসছে। আমার মনও ওই জ্যোৎস্নার মত হয়ে গেছে। সোমপায়ীদের মত আমি জ্যোৎস্না পান করে আকাশ গঙ্গায় ভাসছি। হঠাৎই মনে হল তুষারশুভ্র পাহাড়ের চূড়োর আটকে থাকা চাঁদ যেন ধূর্জটির জটাজালে চন্দ্র হয়ে শোভা পাচ্ছে। আর পাদদেশের শেষনাগ হ্রদ মহাদেবের কণ্ঠহার নাগরাজ হয়ে গেছে। অজ্ঞাত রহস্যালোক

থেকে ভেসে আসছে ঘুঙুরের শব্দ। ডুগডুগির ডিম ডিম আওয়াজ। বেশ বুঝতে পারছি নটরাজ পাহাড়ভূমিতে নৃত্য করছেন তা তা থৈ থৈ করে। হীরা-পান্না ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। হাসি কান্নার তরঙ্গের দোলায় দুলছে আমার বক্ষপিঞ্জর। মনে মনে বলছি হে নটরাজ আমার মাথার ওপর পা রাখ। সব সন্তাপহারা শিব হয়ে দাঁড়াও। একবার আমার মাথার ওপর হাত রাখ হে নটরাজ। আমার সব দাহ জুড়িয়ে দাও। মোহজাল মুছিয়ে দিয়ে তোমার মত মুক্ত করে দাও।

কনকনে ঠাণ্ডায় শরীর জমে যাচ্ছিল। তাঁবুতে না ফিরে উপায় ছিল না। গায়ে লেপটা জড়িয়ে বসে থাকি। মনের ভাবান্তরে হাসি পেল। জীবন মানে তো মুক্তি নয়, ভোগের বাসনা। আকণ্ঠ ভোগ করব মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। এই তো মানুষ চায়। কিন্তু সেখানে অকস্মাৎ বৈরাগ্য ভাব উদয় হল কেন? তবে কি ভোগে বিরাগ জমল? মন এত অন্তর্মুখী হল কেন? একী বয়সের কোন ব্যাপার। বয়সের গায়ে সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে বলে কি জীবন-বিমুখ হয়ে পড়লাম? কী জানি? পাহাড়ই হয়ত ঘর ছাড়তে প্ররোচিত করে। পাহাড়ের ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য, একাকীত্ব বোধ হয় মানুষকে অধ্যাত্ম ভাবাপন্ন করে। একমাত্র পাহাড়ে এলেই মনটা এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু যারা পাহাড়ে বাস করে, কত কষ্ট এবং অসুবিধের মধ্যে থাকে তারা। তবু তাদের মনে এরকম কোন বৈরাগ্যের ভাবোদয় হয় না। তা হলে পর্যটকদের এমন ভাবান্তর হয় কেন? ঈশ্বর নামক যে অদৃশ্য আনন্দময় অনুভূতি আছে হয়ত এ তারই আনন্দরস পান। অথবা নিজের ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে কিংবা নিজের জীর্ণ, মলিন, অভ্যাসের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা 'আমি'টা এই দেবভূমিতে অন্য এক বিরাট আমি'র কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে নবীকৃত করে। নতুন করে প্রাণ পায়। মনের ভেতর এই আকাঙ্ক্ষাটা ছিলই, তবে এমন গভীর করে চোখ খুলে নিজেকে দেখা যেমন হয়নি, মন দিয়ে অনুভব করা হয়নি। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার মধ্যে বাইরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি। আর তাতেই নতুন করে প্রাণ পাই। মন আলো করা প্রসন্নতায়, প্রফুল্লতায় আমার হৃদয় মন কানায় কানায় ভরে যায়। তখন মনে হয় এখানকার আকাশে বাতাসে অফুরন্ত মুক্তির হাওয়া বইছে।

যতক্ষণ তাঁবুতে একা বসেছিলাম ততক্ষণ মনে হচ্ছিল পেটের খিদে, বুকের ব্যথা হয়ত বোঝানো যায়, কিন্তু অন্তরের খিদে কিংবা অন্তরের হাহাকারকে বোঝাই কি করে? যা অব্যক্ত, অন্তর্লীন কথা তা তো নিজেকেই বোঝান যায় না, অন্যকে বোঝাব কোথা থেকে? অন্তর্মুখী মানুষ-মানুষীর তাই বোধ হয় এত দুঃখ পৃথিবীতে। সে মানুষের মত এত একা এবং নিঃসঙ্গও বোধ হয় কেউ নেই।

শেষনাগে অনেক আগেই আমি পৌঁছে গেছি। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। পহেলগাঁওতে ফিরে দেখা হওয়ার কথা। যাই হোক, রাত কাটানোর জন্য তাঁবু নিয়েছি একেবারে পথের শেষপ্রান্তে। সুতরাং আমাদের দলে যাঁরা হেঁটে আসছেন যাতায়াতের পথে ছাড়া তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নেই। হঠাৎই পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। লেপ ছেড়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে এলাম। সহযাত্রীদের দেখে ভেতরটা উল্লসিত হল। এরকমটা হতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি। কারণ, কোন তাঁবুতে আমি আছি, তা তো এঁদের জানার কথা নয়। তবু জলকাদার মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে হাজার হাজার তাঁবুর মধ্যে থেকে তারা তো আমায় খুঁজে পেল। অমরনাথের কৃপায় একত্রিত হলাম। আনন্দে চোখে জল এল। বাবা অমরনাথকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার মন দিয়ে এই পাহাড়ভূমিতে সর্বদা তাঁকে অনুভব করছি। তাঁর নিশ্বাস আমার গায়ে লাগছে। এক আশ্চর্য পুলকে সারা শরীর মন অবশ হয়ে আসছে। আমার প্রতি তাঁর অশেষ দয়া করুণা বলে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রেখেছেন। বিজন প্রদেশে পাছে কোন কষ্ট বা অসুবিধে হয়, তাঁবুতে একা থাকতে ভয় পাই, তাই হাত ধরে আমার তাঁবুতেই ওদের পৌঁছে দিলেন। নইলে, রাতের অন্ধকারে, ক্লান্ত শরীরে পিছল কর্দমাক্ত পথ ভেঙে ওরা আসবে কেন? আমিই বা ওদের খুঁজে পাব কেন? ওরা তো শেষনাগের দোরগোড়ায় যে তাঁবু পড়েছে সেখানেই থেকে যেতে পারত। কিন্তু তা না করে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এল। জল কাদা ভেঙে এতটা পথ তো না এলেও চলত তাদের। তবু ওরা এল। আবার সেই মুহূর্তে অন্যমনস্কতা থেকে আমাকেও চাঙ্গা করে তোলা ছিল তাঁর অনন্ত অনুগ্রহ। নইলে ওদের সঙ্গে মিলিত হতে পারতাম না। বারংবার মনে হতে লাগল এই দেবভূমি হিমালয় জুড়ে রয়েছে তাঁর অনন্ত করুণা।

দেবতাত্মা হিমালয়ের কোলে বসেই অনুভব করা যায় তাঁর দয়া ও করুণা। কিন্তু এতো চোখে দেখার বস্তু নয়, মন দিয়ে শুধু জানতে হয়। সেই অবস্থায় না পড়লে তাঁকে জানা হয় না। মনের গভীরে বহু বছর ধরে পুষে রাখা এই বোধটা আচমকা এক আকাশ আলো আঁধারের মধ্যে রূপময় হয়ে উঠল। শ্রাবণী পূর্ণিমার আগের রাত। দূরে তুষার ধবল পাহাড়ের গায়ে পড়েছিল চাঁদের আলো। মেঘগুলো যেন ধূসর রঙের ওড়না পরে ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের গায়, পর্বত শিখরের মাথায় মাথায়। পাহাড়ী মেঘের প্রকৃতি বড় চঞ্চল। বর্ষণের ধারাগুলোও তেমন ঘন নয়। ঝুর ঝুর করে একটু জল ঝরে পড়ে আবার থেমে যায়। পাহাড়ের রাত রূপসী রাত। রাতের নৈসর্গিক পরিবেশটিতে কনকনে ঠাণ্ডায় উপেক্ষা করে উপভোগ করেছিলাম।

এই দুর্লভ রূপ তো এ জীবনে আর দেখা হবে না। তাই প্রাণভরে দেখে নিচ্ছি। ছোট্ট একটু ক্ষণিকের জন্য মনটার বিশ্রাম নেই। একটি কথা ভাবতে না ভাবতে মন অন্য এক বিষয়ে ঝাঁপ দিয়ে আর এক দরিয়ায় গিয়ে পড়ে। মনের যেন কোন কূলই নেই। শুধুই ছুটছে। কি যেন পেতে চাইছে মনই জানে।

শেষনাগের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বারংবার মনে হতে লাগল। সারা ভারতের মানুষকে একাত্মতার নিবিড় বন্ধনে পরমাত্মীয় করে গড়ে তোলার জন্যই এ মহাযাত্রা যেন। তিনি এর উদ্যোক্তা। এমন প্রকৃতিময় পরিবেশেই দেবাত্মা হিমালয় জীবন্ত দেবতা হয়ে ওঠেন। এক পরম যোগী যেন মহামানবের মিলন সাধনায় মগ্ন। তাঁর সাধনা মানুষের জন্য, মানবিকতার জন্য, বিশ্বের সবাইকার জন্য। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। মানুষই তাঁর কাজের ভেতর দিয়ে ঈশ্বর হয়ে যান। মানুষের মধ্যে তাঁর প্রকাশ। এই বোধ চিরজয়ী হয়ে আছে ভারতবাসীর মনে এবং বিশ্বমানবের মনেও। দেবতা যে মানুষের আবিষ্কার এবং তারই সৃষ্টি এই অনুভূতি আমাকে নতুন প্রাণ দিল। আমি এক জীবন্ত অমরনাথের দর্শন পেলাম।

পরের দিন সকালে ঝড় বৃষ্টির জন্য যাত্রা করতে দেরি হল। অমরনাথের গুহার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য যখন তোড়জোড় করছি তখন দেখি ঘোড়ায় করে আসছে ঝুমা। আমার এক সহযাত্রিণী। অল্প বয়সের মেয়ে। দোহারা চেহারা। কিছুদিন হল ওদের বিয়ে হয়েছে। সংসার বলতে ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন। সন্তান হয়নি। অমরনাথের আশীর্বাদ নিয়ে পুরো সংসারী হওয়ার সাধ। এজন্যে ওদেব অমরনাথে আসা। প্রকৃতির উদার অভিব্যক্তিতে ঘর কুনো স্বভাবের মানুষও তাজা হয়ে ওঠে, নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে চলে। ওদের অভিযাত্রী মনটি পাহাড় দেখে লাফিয়ে উঠেছিল। দুর্গমকে জয় করার দুর্বার বাসনা নিয়ে ঝুমা নির্ভয়ে হাঁটা শুরু করল। কিন্তু স্ত্রীর সামর্থের ওপর সোমনাথের আস্থা ছিল না বলে গোড়া থেকে ঘোড়া নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল।

কিন্তু ঝুমা দম্ভ করে বলল : আমি ট্রেকিং করা মেয়ে। আমি কী ডরাই কভু দুর্গম গিরিকে? স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাব। মেয়ে বলে আমার সামর্থ্যকে খাটো করে দেখো না। মেয়েরা নন্দাঘুন্টি জয় করে দেখিয়ে দিয়েছে তারা ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দেখে নিও একদিন এভারেস্টের শৃঙ্গেও পা রাখবে তারা। তখন তোমাদের চোখ ফুটবে। মেয়েদের প্রতি একটু ভরসা রাখতে শেখ।

ঝুমার কথা শুনে বাবা অমরনাথ বোধ হয় অন্তরালে খুব হেসেছিলেন। ঘুড়ির সুতোর লাটাই তো তাঁর হাতে। তিনিই মালিক। লাটাইর সুতো ছাড়লে তবেই ঘুড়ি

আকাশের সঙ্গে মিতালী করতে পারে, নইলে ঘুড়ির সাধ্য কি আকাশে ডানা মেলে দেবার! অনেক মূল্য দিয়ে ঝুমা তা জানল। তেমনি ঝুমাকে না পেলে আমার জীবন্ত অমরনাথ দর্শন করা হত না। তিনি যে সর্বভূতে আছেন, ভীষণভাবে আছেন ঝুমার ভেতর দিয়ে তা দেখার সৌভাগ্য হল আমার। মানুষের রূপ ধরে স্বয়ং অমরনাথ ঝুমাকে কাঁধে করে বয়ে এনেছেন অমরনাথে পৌঁছে দেবেন বলে। ভাবতে পারা যায়? তাঁর করুণা স্বচক্ষে দেখেছি এবং অনুভব করেছি। যত ভেবেছি তত বিস্মিত হয়েছি। এও কি সত্য! ওই দিগন্তজোড়া পর্বতমালা আমার কাছে আর নিষ্প্রাণ নয়। ওরাই জীবন্ত অমরনাথ। আমি দেখেছি, মানুষের রূপ ধরে করুণার হাত বাড়িয়ে ধরেছেন ঝুমার দিকে। সে একটা গল্প। যে শুনেছে তার চোখে আনন্দ। হৃদয়ে পরম তৃপ্তি।

প্রথমটা ঝুমা বেশ হাঁটল। পিসু টপ উঠতেই হাঁফিয়ে গেল। একটু করে হাঁটে আর দাঁড়ায়। সোমনাথ বৌকে একা ফেলে নিজের মত এগিয়ে যেতে পারল না। বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঝুমার অপেক্ষা করে। এভাবেই পিসু টপে উঠল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ঝুমা। সামনে রাস্তা এতটা চড়াই নয় আর। স্বস্তির শ্বাস পড়ল ঝুমার। অমরনাথ যাত্রার দ্বারপাল পিসুর কঠিন পরীক্ষায় যখন পাশ মার্ক পেয়ে গেছে তখন বাকি পথের দুর্ভোগের পরোয়া করে না সে। ঝুমার সামর্থ সম্পর্কে সোমনাথের আর কোন সংশয় রইল না। কিন্তু ভরসা করতে পারছিল না।

পিসু টপে লঙ্গরখানায় ওরা দুপুরের খাওয়া সারল। সেলো চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিল। শরীরটা চাঙ্গা করে আবার হাঁটা শুরু করল। নয় কিলোমিটার পথ হাঁটলে তবে শেষনাগে পৌঁছবে। রাতে ওখানেই খাওয়া এবং থাকা। পথের মধ্যে আর কোথাও থাকার জায়গা নেই। আবার রাস্তা বলতে যা বোঝায় পাহাড়ে কোথাও তা নেই। যাত্রীদের পায়ে পায়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। কাদায় কাদায় জেরবার। ইলশেগুঁড়ির মত বৃষ্টি তো লেগেই আছে। চড়াইয়ের পথ বেশি পিচ্ছিল, উতরাইয়ের পথে তেমনি পুরু কাদা। জল কাদার সঙ্গে লড়াই করে এগোতে হচ্ছে। ঝুমার অবস্থা করুণ। হাঁটতে যেমন কষ্ট হচ্ছিল, তেমনি হাঁফ লাগছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে এবং বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিল। ঝুমার কষ্ট দেখে সোমনাথ অসহায়ের মত বলল : শেষনাগের আগে রাত কাটানোর কোন আস্তানা নেই। এভাবে হাঁটলে রাতের ঠাণ্ডায় পথে জমে যেতে হবে। পিসুটপে পই পই করে ঘোড়া নিতে বললাম। কিন্তু আমার কথা শুনলে না। জেদ করে বসে রইলে। জানি, পাহাড় কারো জেদের ধার ধারে না। এখন কী হবে বল তো। সমানে খোঁড়াচ্ছ। মুখে কষ্টের

ছাপ, চোখে কেমন একটা অসহায়তা। এখন কী করি বলতো? পিছল পথে তোমাকে কোল পাঁজা করে যে হাঁটব তারও উপায় নেই। কতক্ষণই বা সেভাবে হাঁটা সম্ভব! কমপক্ষে তিন কিলোমিটার পথ এখনও হাঁটতে হবে।

ঝুমা মিন মিন করে বলল : তুমি যাও। আমার কথা ভাবতে হবে না। পাহাড়ে যদি আমার মরণ থাকে তুমি পারবে না ঠেকাতে। কার মরণ যে কোথায় আছে ভগবানই জানেন। কথাগুলো বলে বহুকষ্টে হাসল ঝুমা। বলল : বাবা অমরনাথের কোলে নিবিড় সুখে ঘুমাব। তুমি যাও।

অসহায়ের মত সোমনাথ বলল : মুখে বলা সহজ। কী যে করি? একটা ঘোড়াও দেখতে পাচ্ছি না। লোকজনও কমে গেছে। সত্যি ভয় করছে আমার।

—সোমনাথ আমার আর হাঁটার ক্ষমতা নেই। পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। আমায় ফেলে চলে যাও। তীর্থযাত্রীরা সবাই তাই করে। পাহাড় আর মরুভূমিতে প্রত্যেককে একাই যেতে হয়। মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী পথের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বসে পড়ে। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের কেউ প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করেনি। মায়া, মোহ ত্যাগ করে পঞ্চপাণ্ডব এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। একজনের জন্য অন্যদের যাত্রা পণ্ড করতে নেই। এটাই নিয়ম। গুহা দর্শন আমার কপালে নেই, তুমি কী করবে? বাবা অমরনাথ আমার যাত্রা পথ এই পর্যন্ত ছকে রেখেছেন। এর বেশি যাব কী করে? নাইবা হল গুহা দর্শন। তাঁর কোলে তো শুয়ে আছি। এ আমার শান্তির মরণ।

সোমনাথ কেঁদে ফেলল। ঝুমাও কাঁদে ওর সঙ্গে। ওদের মত দুঃখী দম্পতি এই পাহাড়ে আর একজনও নেই। দুঃখের দেমাকে ওদের প্রেম ঝলমল করে উঠল। এই মুহূর্তে এক গভীর কারণহীন প্রশান্তি ধীরে ধীরে তাদের পরিপূর্ণ করে তুলল। মনে হল, তাদের কোন অভাব নেই, দুঃখ নেই, সুখ নেই। ঝুমা চোখের জল মুছে হাসছিল। বলল : প্রার্থিত সব জিনিসই যদি সহজে পাওয়া হয়ে যায় তা হলে তার কানাকড়ি দাম থাকে না। ভগবানও বোধহয় তা চান না।

সোমনাথ ওর পাশে বসে চোখে চোখ রেখে বলল : দ্যাখ পাহাড়ের গায়ে লেগেছে সূর্যাস্তের আলো। ওই স্থির পর্বতমালা আমাদের দুঃখে দুঃখী। কী ভীষণ বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে পর্বত জুড়ে। বহুবর্ণের মেঘেরা আমাদের অসহায়তার বার্তা নিয়ে কী দ্রুত উড়ে যাচ্ছে অমরনাথের দিকে! বাবা ভোলানাথের ওপর বিশ্বাস রাখ! তিনি একটা উপায় করবেন। আমার মন তাঁর চরণধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। তাঁর পায়ে ঘুঙুর বাজছে। তিনি আসছেন! না এসে পারেন না।

খাকি রঙের পুলিশের ইউনিফর্ম পরা এক রোগাটে যুবক ওদের সামনে এসে

দাঁড়াল। তাকে দেখে ঝুমা মুখ নিচু করে দু'হাতে মুখ ঢাকল। ঢেকেই, হঠাৎ অসংযতভাবে ডুকরে কেঁদে উঠল। কিন্তু চাপা কান্না। যন্ত্রণার কান্না। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা যুবক আশ্চর্য হয়ে অনাত্মীয় যুবতীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। মুহূর্তে সব সংকোচ, লজ্জা ঝেড়ে ফেলে বলল : এক্ষুণি ওকে ফাস্ট এড দিতে হবে স্যার। কিন্তু উনি যাবেন কী করে? শেষনাগ তো এখন অনেক দূরে।

সোমনাথ ঝুমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে অসহায়ের মত ওর সব ব্যথা যন্ত্রণাকে লাঘব করে দেয়ার জন্য গালের ওপর, ঘাড়ের ওপর চুলের ওপর মুখ রাখল। ঠোঁট দিয়ে তার সব কষ্টকে বেদনাকে যেন সে শুষে নিতে লাগল।

যে ভালবাসে ভালবাসার দুঃখ দেখলে তার বুক ফেটে যায়। ভালবাসার জন্য অন্যকে কাঁদতে দেখলে তার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়। পুলিশ ছেলেটি অবাক হয়ে একবার সোমনাথ আর একবার ঝুমার দিকে তাকাতে লাগল। তার বুকে দয়া, মায়া করুণার সাগর উথলে উঠল। বলল : আমি ইব্রাহিম। জম্মু কাশ্মীর স্টেটের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। বহিনকে বাঁচাতে হলে এখনি ফাস্টএড সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। এই দুর্গম পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটা চলা করতে আপনারা অভ্যস্ত নন। অন্য কোন উপায় নেই। আপনি অনুমতি দিলে বহিনকে একাই আমি কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারি। কষ্ট হবে ঠিক। কিন্তু এছাড়া তো উপায় নেই।

সোমনাথ হাতে চাঁদ পেল। কৃতজ্ঞচিত্তে বলল : এর চেয়ে উত্তম কথা আর কি হতে পারে। তোমার বহিনের জীবনের সব ভার তুমি নাও ভাই।

ইব্রাহিম ইনসা আল্লা বলে অসংকোচে ঝুমাকে কাঁধে তুলে নিল। বলল, পথে ঘোড়া পেলে ভাল। না হলে, আল্লার মর্জি—।

সোমনাথ হতবাক। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আনন্দে একাই উচ্চৈস্বরে বলল : বাবা অমরনাথ কী জয়! জয় মানুষের ভগবান!

ইব্রাহিমের গায়ে তখন বাঘের বল। বাঘ যেমন শিকার মুখে করে দৌড়ায়, ইব্রাহিম ঝুমাকে কাঁধে করে পিছল কর্দমাক্ত পথে দৌড়তে লাগল। এরা পাহাড়ের সন্তান, পাহাড়ের কাঠিন্য, বাঁধা, বিপত্তি দিয়ে এদের দেহমন তৈরি। মুক্ত পরিবেশের উদারতার প্রভাব পড়েছে এদের স্বভাবে ও মননে। পাহাড়ী মানুষের সরলতা, সততা, ভালবাসা, আন্তরিকতা, দায়বদ্ধতা, কর্তব্যবোধ এতই প্রাণখোলা এবং অমায়িক যে তার মধ্যে কোন মালিন্য নেই। শেষনাগ পর্যন্ত তিন কিলোমিটার পথ ঝুমাকে কখনও একটু হাঁটিয়ে, কখনও কাঁধে নিয়ে শেষনাগে পৌছল। পয়লা তাঁবুর খাটিয়াতেই ঝুমাকে শুইয়ে দিল। ছোটাছুটি করে গরম জল এবং বোতল জোগাড়

করে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে হাত পা সেঁকে দিল নিজের হাতে। যুবক ইব্রাহিম তরুণী ঝুমাকে সেবা-শুশ্রুষা করল মায়ের মত, কন্যার মত, ভগিনীর মত। কম্বলে ওর দেহটা মুড়ে নিয়ে কাঁধে করে তাঁবুর পিছনে পাহাড়ের উঁচু জায়গার টয়লেটে নিয়ে গেল। স্বামী হয়ে সোমনাথ যা পারেনি ভিনদেশী বিধর্মী ইব্রাহিম পিতার মত, ভাইয়ের মত সেই কাজগুলো অনায়াসে করল। শুধু তাই নয়, ঝুমার শরীরে তখন খিঁচুনী শুরু হয়ে গেছে। কাঠের আগুন করে একটি মাটির পাত্রে ভরে লেপের মধ্যে রাখল শরীরটাকে গরম করার জন্য। সারা রাত ইব্রাহিম জেগে বসে রইল ঝুমার শিয়রের পাশে। ঝুমার জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দিল, বলল : ভগিনী তোমার কোন ভয় নেই। কাল তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। তোমার ঘোড়ার সঙ্গে পঞ্চতরণী পর্যন্ত আমি যাব। ওখান থেকে অমরনাথ স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবে। আমি বলছি, বাবা অমরনাথের দর্শন তুমি পাবে। তোমাকে না পেলে তাঁর পূজো সম্পূর্ণ হবে না।

সোমনাথের গায়ে কাঁটা দিল। কথা তো নয় হীরে বসানো ফুল। দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে তা থেকে।

তৃপ্তিতে, আনন্দে, ঝুমার দু'চোখ বুজে এল। পরের দিন শেষনাগ থেকে যাত্রার সময় ইব্রাহিমকে দেখার সৌভাগ্য হল আমার। নজর কাড়ার মত চেহারা তার নয়। তবু তাকে দেখে বারংবার মনে হল, অমরনাথের পথে এ আমি কোন অমরনাথকে দেখলাম! এ তো জীবন্ত অমরনাথ। একে আমি চিনি, জানি, দু'চোখ ভরে দেখতে পাই, ওর শ্বাস আমার গায়ে লাগে, ওকে আমি স্পর্শ করতে পারি, ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারি। ভাল মন্দ ভেদ করে একজন সম্পূর্ণ মানুষকে দেখলাম। ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, অন্ধবিশ্বাস ও ভক্তির উর্ধ্বে এক অন্য মানুষকে দেখলাম। যে মানুষ অন্যের কষ্টে অকাতরে প্রেম ঢেলে দিতে পারে, যার মহত্ত্ব, মমতা, করুণার কোন পরিমাপ হয় না। ইব্রাহিমকে মনে হল প্রেমময় ভগবান। গুহাদর্শনের যাত্রা পথে এক জীবন্ত অমরনাথকে দেখার সৌভাগ্য আগেই হল আমার। ওর মধ্যে দেখতে পেয়েছি ভারতবর্ষের সত্যকার রূপ।

ঝুমা আমার সহযাত্রী না হলে জীবন্ত অমরনাথের দর্শন হত না এ জীবনে। সর্বভূতে তিনি আছেন। মানুষের রূপ ধরে ভগবান নিজের কাঁধে করে তার ভক্তকে অমরনাথের পথে পৌঁছে দিয়েছেন। নিথর স্তব্ধ শিলারূপী হিমালয় তো ঝুমার জন্যই রক্তমাংসের শরীর হয়ে সাড়া দিল। হিমালয় জড় নয়, তারও প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে। তিনি আর অচল, অনড় নন। যে মানবরূপ ধরে মানবশিশুকে বয়ে আনলেন তাঁর করুণাঘনরূপ তো স্বচক্ষে দেখলাম। এখন আমি কাকে প্রণাম করব? ঐ দিগন্ত

জোড়া পর্বতমালাকে, না ঐ বিধর্মী মানবসন্তানকে, না দেবতার করুণা ধন্যা মানবী কন্যাকে? এঁরা তিনজনই আমার অনুভূতিতে একে অপরের পরিপূরক। জীবন যখন মহাসঙ্গীত হয়ে ফুটে ওঠে তখন সঙ্গীত ও সাঙ্গীতিকের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকে না। দুইই হয়ে যায় একাত্ম।

ঝুমা আমার সঙ্গেই ঘোড়ায় রওনা হল অমরনাথে। সোজা হয়ে বসার শক্তি ছিল না ঝুমার। সারা শরীরটি তার বেঁকে গেছিল। ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হয়ে বসেছিল। কেমন একটা কষ্টকর ক্লান্তি ওর চোখে মুখে লেগে রইল। ইব্রাহিমের ভরসাতেই ঝুমাকে একা ছেড়ে দিয়ে সোমনাথ পায়ে হেঁটে চলল। পঞ্চতরণী পর্যন্ত ইব্রাহিম ওর সঙ্গে থাকবে। তারপর ঝুমার দায়িত্ব নেবে কে? আমি তো ইসকিমিয়া পেশেন্ট। উচ্চতাজনিত কারণে এমনিতে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোদ্দহাজার ফুট উঁচু মহাগুনাসে আমি কতখানি সুস্থ থাকব সে ঈশ্বরই জানেন। তাই যেতে যেতে ঝুমাকে বললাম : সোমনাথ তো একটা ঘোড়া নিতে পারত। অসুস্থ স্ত্রীকে এভাবে অচেনা, অজানা পথে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। কথাটা অপ্রিয় হলেও বলব, স্ত্রীর প্রতি সোমনাথ তার মানবিক দায়িত্বটুকু পালন করেনি।

আমার কথা ঝুমার মনঃপুত হয়নি। ক্ষীণ কণ্ঠে অভিযোগের প্রতিবাদ করে বলল, আপনার মত বয়স্ক হার্ট পেশেন্ট কারও ভরসা না করে যদি এ পথে সাহস করে একা যেতে পারে তাহলে আমি ভয় পাব কেন? মেয়ে বলেই অভরসা। আমি বলছি, আপনি নিজের মত যাবেন, আমার কোনও দায়িত্ব নিতে হবে না আপনাকে।

ওর দম্ভে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলি : তোমার দায়িত্ব নেওয়ার আমি কে? আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু যে দম্ভ করে বলব, আমি তোমার রক্ষাকর্তা। সে বয়স আমার নেই। নিজেকে অমরনাথের জিম্মায় রেখে নির্ভাবনায় আছি। বাঁচা-মরা, কিংবা তাঁর দর্শন পাওয়া সব তাঁর ইচ্ছে। আমি শুধু দুরন্ত ইচ্ছের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছতে চাইছি। নিজেকে নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই। এমন কি পেছনের কোন টান নেই। সব ভুলে দিব্যি আছি। আনন্দে আছি।

ঝুমা বলল : আপনার বিশ্বাসের মধ্যে একটা আশ্চর্য জোর আছে। কিন্তু আমার তা ছিল না বলেই আমাকে সাজা পেতে হল।

বললাম : ঝুমা, সাজা কথাটা না বলে সংশোধন শব্দটা ব্যবহার কর। তোমার দর্প চূর্ণ হয়েছে কিন্তু এখনও চিত্ত সংশোধন হয়নি।

ঝুমা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল : কাল যখন মরতে বসেছিলাম তখন ইব্রাহিম ভাইকে কাছে না পেলে শেষনাগ পৌঁছনো হত না। মনে হচ্ছিল, ইব্রাহিম নয়

ভগবানের কাঁধে চড়ে শেষনাগে এলাম। বাবা অমরনাথকে ডাকার শক্তি ছিল না আমার। তবু অন্তরের মধ্যে তাঁর নাম শুনলাম। মন বলল : তোর ভগবান প্রেমের ভিখারি। তাকে ডাকতে হয় না, মানুষের দুঃখ কষ্টে নিজে এসে ধরা দেয়! আমার কী হল জানি না। সোমনাথ খুব কাঁদছিল! ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম : গুহা দর্শন যদি নাও হয় তা হলেও জানব শিবের কোলে আমি ঘুমিয়ে আছি! বাবার কোলে ছোট্ট মেয়ে যেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোয় তেমনি ঘুম ঘুমাব। তুমি কিন্তু বাবাকে দর্শন করে ফিরবে। ঝুমা তার বাবার কাছে পরম আদরে থাকবে। তারপর আর জানি না। যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম ইব্রাহিম গরম জলের সেঁক দিচ্ছে আমাকে।

আমি বললাম : পথে পথে অমরনাথের মহিমা। তোমার ভক্তিতে শিলাময় পাহাড়ও প্রাণ পেয়েছেন। তিনি মানুষের মধ্যেই সুপ্ত আছেন। সব কিছুর ভেতরে আছেন। পুরাণে আছে, তিন কূর্মের মধ্যে, বরাহের মধ্যে, মীনের মধ্যে, সিংহের মধ্যে, পরশু'র (কুঠার) মধ্যেও আছেন। ভগবান মানুষের সৃষ্টি। অন্তরে প্রেমভক্তি হলে তবে অধ্যাত্ম উপলব্ধি হয়। তোমার প্রতি রোমকূপে তাঁকে উপভোগ করেছ, তাঁর সঙ্গে লীন হয়ে গেছ বলে পরোপকারী, মানবপ্রেমিক, সেবাপরায়ণ ইব্রাহিমের মধ্যে অমরনাথকে খুঁজে পেয়েছ। তোমার কথা শুনে ঐ মুসলমান যুবকের প্রতি আমার আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধা ভীষণ বেড়ে গেল।

ইব্রাহিম আমাদের কথা কী বুঝল সেই জানে, তবু কথার রেশ টেনে বলল : অ্যাসা খতরনাক হোতে হুয়ে সে ভী দেখনে মেঁ বহুৎ আনন্দ। অ্যাসা তীরথ কাঁহা ভী নহী মিলতা।

আবেগ মাখা চোখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

আকাশের মেঘ সরে যেতে শেষনাগের চারিদিকে পাহাড়ে নরম রোদ উঠল। কালো পাথরের খাঁজে খাঁজে বরফ জমে আছে। কিছু কিছু জায়গায় পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনা নেমে আসছে। একটু এগিয়ে গেলে ছোট ছোট জলপ্রপাত প্রচণ্ড শব্দ করে নিচে আছড়ে পড়ছে। পর্বত শিখর থেকে উচ্চতর পর্বত শিখর দেখার এ যেন এক নূতন দৃষ্টি। তুষার আর ঝরনার জটা ছড়িয়ে পর্বতগুলি সবাই যেন একযোগে ধ্যানাসনে বসে আছে। কোন চাঞ্চল্য নেই। একেবার মৌন এবং স্তব্ধ। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল কত কবির মানস রাঙানো এই দেবভূমি হিমালয়। কাব্য কাহিনীতে তার কত রূপ ও রঙের বাহার। শেষনাগ সত্যি সুন্দর। সুন্দর এই পার্বত্যভূমি। প্রতি পদক্ষেপে এখানে শিবদর্শন ঘটে। বলতে কি ওই হাতছানির টানে সম্মোহিতের মত আমি এগিয়ে চলেছি। ঝুমার ঘোড়া আমাকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে

গেছে। অসংখ্য ঘোড়ার মধ্যে মানুষের মধ্যে তাকে আইডেনটিফাই করতে পারছি না।

পর্বতশ্রেণীর পাদপীঠে-বিস্তৃত একটু সমতলভূমি। কোথাও কোন গাছ নেই। শুধু আছে একটু সবুজ ঘাসের ছোঁয়া। জায়গাটির নাম বায়ুযান। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে সর্বক্ষণ। হাওয়ার বেগ কখনও আস্তে, কখনও জোরে। বাতাসের অত্যাচার এবং আক্রোশ থেকে এক লৌকিক গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুপ্রবাহের ফলে যাত্রীরা নাকাল হয় বায়ুযানে। তাই বায়ুকে একজন ভয়ঙ্কর অত্যাচারী দৈত্যরূপে কল্পনা করা হয়েছে! যেহেতু হরপার্বতীর দেশ এটা সেজন্য ওখানকার সব কিছুই শিবের মহিমার মোড়কে মোড়া। বায়ুযান একজন শিবভক্ত দৈত্য। তবু অমরনাথ দর্শনে যেসব যাত্রী এই পথে যাতায়াত করত বায়ুযান তার ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ত। অনেক প্রাণহানি হত। এমন কি দেবতারা পর্যন্ত রেহাই পেত না। মহাদেবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের এই পথটি ছিল তাদের কব্জায়। তাদের ত্রাসে দেবতারা পর্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করত। নিরুপায় দেবতারা শেষে মরিয়া হয়ে শিবভক্ত দৈত্য বায়ুযানের বিরুদ্ধে শিবের কাছে নালিশ জানাল। বলল : হে মহেশ্বর, ভক্ত বায়ুযানের বিপক্ষে কিছু বললে পাছে আপনি রুষ্ট হন তাই মুখ বুজে তার সব অত্যাচার দীর্ঘকাল সহ্য করছি আমরা। কিন্তু আর তো পারছি না। আমাদের সহিষ্ণুতায় তার সাহস বেড়ে গেছে। এখন সে একজন ভয়ংকর অত্যাচারী। আপনি ছাড়া তাকে শাসন করবে কে? আপনি তাকে নিরস্ত করুন।

মহাদেব বলল : আমার বরে সে পাষণ্ড হয়েছে সত্য, কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করার শক্তি আমার নেই। তোমরা বরং বিষ্ণুর কাছে যাও। তিনি সব শুনে প্রতিকারে তৎপর হবেন।

দেবরাজ সাহস সঞ্চয় করে বলল : হে দেবাদিদেব অপরাধ নেবেন না। ভক্তের উপর আক্রমণ হলে আপনি তো চুপ করে থাকবেন না। আপনাকে স্মরণ করা মাত্র তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে যাবেন। তাই বিষ্ণুর পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

শিব স্তব্ধ হয়ে শুনলেন। তারপর বাধ্য হয়ে বললেন : দেবতা এবং মানবের দমনের জন্য পালক পিতা নারায়ণ যদি বায়ুযানকে হত্যা করতে তাঁর সুদর্শন চক্র উত্তোলন করেন তা হলে তাঁর কাজে বাধা দেব না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেবতারা পরিত্রাণের আশায় বিষ্ণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। বায়ুযানের অত্যাচারের কথা এবং মহাদেবের অভিমত নিবেদন করে ইন্দ্র বললেন : আপনিই আমাদের ভরসা। আপনি ছাড়া ওই দৈত্যকে কেউ নিরস্ত করতে পারবেন

না। অথচ, আমরা জানি, আপনি চাইলেই বায়ুযানের ভয়ংকর অত্যাচার থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি।

বিষ্ণু তখন বায়ুযানকে দমন করার জন্য শেষনাগকে পাঠালেন। রক্তপাত না ঘটিয়ে দৈত্যের ত্রাস থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য শেষনাগ শতফণা বিস্তার করে এক নিঃশ্বাসে বায়ুযানের সব বায়ু নিমেষে শুষে নিল। অমনি বায়ুহীন হয়ে গেল বায়ুযান। শ্বাসের জন্য যে বাতাসটুকু দরকার তাও ছিল না। ফলে শ্বাস নিতে না পেরে বায়ুযান প্রাণত্যাগ করল। বায়ু দৈত্যের উৎপাতও বন্ধ হল। কিন্তু তার নামে উপত্যকার নাম হল বায়ুযান। অর্থাৎ বায়ুযান, মরে গিয়ে বেঁচে রইল উপত্যকায়। মাঝে মধ্যে এখনও ভূতের মত হঠাৎই উপদ্রব বাধিয়ে দেয়। এ রকম এক উপদ্রবের স্মৃতি তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে আজও অমর হয়ে আছে। সেবারও বহু যাত্রী চলেছিল এখান দিয়ে। অতর্কিতে প্রকাণ্ড একটা তুষার ধস নেমে এসেছিল তাদের ওপর। পালাবার সুযোগ পায়নি। বরফের নীচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল বহু তীর্থযাত্রী। যারা চাপা পড়েনি কনকনে ঠাণ্ডায় তাদের দেহের রক্ত শুধু জমাট বেঁধে যায়নি নিঃশ্বাসের বায়ু খুঁজে না পেয়ে মরেছে। সেদিনের সেই মৃত্যুপুরী আজ সবুজ ঘাসে ঢাকা এক রমণীয় উপত্যকা। ভাবাই যায় না এমন ঘটনা ঘটতে পারে এখানে। খল প্রকৃতির বায়ুযান এখনও মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রেখেছে সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের ফাঁকে ফাঁকে। এই ঘাসের মধ্যে একধরনের বিষাক্ত তৃণ জন্মে। ক্ষুধার্ত ঘোড়া ঐ ঘাস খেয়ে ওখানেই প্রাণ হারায়। তাই আমার ঘোড়ার সহিস শক্ত হাতে ঘোড়ার দড়ি ধরে থাকল।

মানুষের যাত্রা থেমে নেই। মৃত্যুভয়ও তীর্থযাত্রীদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি। নীলগঙ্গার মত অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে দুর্বার গতিতে তীর্থযাত্রীরাও ছুটে চলেছে। তাদের সাথে চলেছে স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, সাধনা, প্রত্যাশা। এই আনন্দ বেদনার তরঙ্গ দোলায় দুলতে দুলতে কত গিরিশ্রেণী পার হয়ে এলাম। সারা শরীরে যন্ত্রণা, শিরদাঁড়া টনটন করছে, নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। তবু জোরে নিঃশ্বাস না নিতে পারলে দম বন্ধ হয়ে যাবে।

চড়াইয়ের যেন শেষ নেই। আবার শুরু হল চড়াই। পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই পথ। বাঁ দিকে নদী, ডান দিকে পাহাড়ের ধার দিয়ে ঘোড়ার দড়ি ধরে সহিস নির্ভয়ে হাঁটছিল। ঝুমাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। ওর অনেক পিছনে আছি আমি। আর কিছুটা গেলে মহাগুনাস। উচ্চতম পর্বত ১৪,৫০০ ফুট। চলছি তো চলছি। চলার শেষ নেই। গুহার দর্শনে যাব। অমরনাথের দেখা পাব। এই প্রত্যাশাটুকুই নেপথ্যে সব শক্তি যোগাচ্ছে। হৃদয়ানুরাগকে ধরে রাখার জন্য শীর্ষবিন্দুতে রাখা হয়েছে

গুহাদর্শনের অমর মহিমা। কিন্তু তার কোন প্রতীক নেই। মন্দির নেই। মহাযোগীর মত ধ্যানস্থ পর্বতমালা যেন যোগীরাজ শিব হয়ে অমরকথা শোনাচ্ছেন যাত্রীদের। তাই এর নেশায় যাত্রীরা চলেছেন। তাদের সামনে স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়ি। তাই উদ্দাম আনন্দে তারা চলেছে। দেবাত্মা হিমালয়ের রহস্যলোকে অমরকথার কথক ঠাকুর বসে আছেন। তাঁকে দর্শন পিপাসায় মানুষ যে এমন পাগলের মত ছোটে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস, কৌতূহল, প্রত্যাশা আশা-আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গদোলায় আমিও নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার বিচারক মনটি সব কিছুর মধ্যে থেকে ওসব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত। খোলা চোখ নিয়ে কতসুখ মানুষের স্রোতে ডুব দিয়েছি, হৃদয়পাত্র ভরে নিয়েছি তাদের সঙ্গ সুখ। পুণ্যকামী যাত্রীদের সঙ্গে আমিও অভিন্ন অচ্ছেদ্য।

এদিককার পথ শুধু খারাপ নয়, দুর্গমও বটে। পাহাড়গুলো বৃক্ষহীন। এমনকি ছোট ছোট জংলী গাছও নেই। নিঃশ্বাসে টান ধরতেই বোঝা গেল মহাগুনাস এসেছি। সমুদ্রতল থেকে সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। এখানে এসে অনেক যাত্রী অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। অসুস্থ যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের সুস্থ করে তবে গুহাদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়। তাই, একেবারে নিরুপায় না হলে কোন যাত্রী ওখানে যায় না। মনের জোরে বাবা অমরনাথের নাম জপ করতে করতে মহাগুনাসের শীর্ষ অতিক্রম করলাম।

মহাগুনাসে চার পাঁচটি লঙ্গরখানা বসেছে। সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল। যাত্রাকালে একটি বিশাল কালো পাথরকে যাত্রীরা প্রণাম করছিল। কেন করছিল সঠিক কেউ বলতে পারল না। সবাই করছে দেখে অন্যেরাও করল। একজন মিলিটারি পথপ্রদর্শককে কৌতূহল বশে জিগ্যেস করি—ওই পাথরকে সবাই প্রণাম করছে কেন? ওই পাথরের বিশেষত্ব কী?

লোকটি একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল : এ প্রশ্ন তো করে না কেউ। আপনি ওই পাথর সম্পর্কে কিছুই জানেন না তা-হলে। উনি হলেন একজন সৌন্দর্য প্রেমিক ঋষি। পর্বতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিভোর হয়ে যান। যাত্রার কথা ভুলে ওখানে প্রস্তরীভূত হয়ে যান। স্থানীয় লোকেরা বলে এই শিলাখণ্ডটি নাকি অমরনাথের দ্বারী! মহাগুনাসের নগরপাল। যাত্রীরা প্রণাম করে ওঁর অনুমতি নিয়ে অমরনাথ যাত্রা করে। এটা যুগ-যুগান্তর ধরে চলে আসছে।

অকস্মাৎ আমার মনে হল এটা শুধু গল্প নয়, আরো কিছু। সব কিংবদন্তির পিছনে একটা বাস্তবতা থাকে। হয়তো, অতীতেও যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে অমরনাথ দর্শনের অনুমতিপত্র নিতে হত। ওই শিলাখণ্ড হল তার ল্যান্ডমার্ক। বলা যেতে

পারে, অতীতের সেই ট্রাডিশন আজও অব্যাহত রয়েছে। সেই নিয়ম এখনও চলছে। পথের নিরাপত্তার জন্যই এই শিলাখণ্ডকে অমরতীর্থের দ্বারী বলা হয়। আর মহাগুনাসকে বলা হয় নগরপাল। মহাগুনাসের ঢাল বেয়ে আরো পাঁচ মাইলের মত পথ হাঁটলে তবেই পঞ্চতরণী। পদে পদে চমক। প্রতিমহূর্তে যেন জীবনের এক একটি অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। প্রতিটি অধ্যায়ের অভিজ্ঞতাই নতুন। এর বাঁকে বাঁকে কত না বিস্ময় লুকোনো।

দূর থেকে পঞ্চতরণীতে তাঁবুর ছাওনি দেখতে পেলাম। গিজগিজ করছে তাঁবু। যাত্রীদের অস্থায়ী আস্তানা। উপত্যকার পাদপীঠে রচিত পাহাড় ঘেরা এক বিশাল প্রান্তর। ভীমা, ভগবতী, সরস্বতী, ঢাকা ও বর্গশিখা পাঁচটি নদীর ধারা মিশে একটি নদী হয়ে গিয়েছে। নামেই নদী। পায়ের গোছ ডোবে না। বালি আর নুড়িতে ভর্তি। এখানে যাত্রীরা স্নান করে অমরনাথ গুহা দর্শনে যাত্রা করে। কিন্তু অবগাহন করার মত অবস্থা এখন আর নেই। তাই ঘটি ডুবিয়ে পুণ্যার্থীদের কেউ কেউ মাথায় জল ঢেলে শুচি হয়ে নেয়। কেউ বা হাত দিয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে দেয়। যাই হোক বালি ও জল পেরিয়ে পঞ্চতরণীর প্রশস্ত প্রান্তরে এসে পৌঁছলাম। পাঁচ দিক থেকে ধারা এসে মিলিত হয়েছে এই সমতলভূমিতে। জায়গাটি অপূর্ব। নানা উচ্চতায় পাহাড়গুলো গায়ে গায়ে ঠেকে আছে। এক পর্বতগাত্রের সঙ্গে আর এক পর্বত যেন জোড়া হয়েছে। আর ঐ জোড়ের জায়গায় নালার মত যে অংশটি সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলের ক্ষীণ ধারা শান্ত ও স্থির হয়ে পড়ে আছে সমতলভূমিতে। ঐ জলে পা ডুবিয়ে তবে যাত্রীদের যেতে হয়। জলের তলদেশ নুড়ি, পাথর আর কাঁকরে পরিপূর্ণ। ঘোড়া থেকে নেমে সবুজ সমতলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎই নজর পড়ল একজন শিল্পী তন্ময় হয়ে রঙ তুলি দিয়ে এখানকার মনোরম প্রকৃতির এক ছবি আঁকছে। কিন্তু বৃক্ষ, লতা, শূন্য বন্ধ্যা প্রান্তরের ছবি আঁকার মত কিবা আছে? তাই, কৌতূহলী হয়ে সুবেশা মহিলা শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা দেখতে লাগলাম।

প্রকৃতির নির্মুক্ত পটে হিমালয়ের শান্ত শ্রীময় ঐশ্বর্যের এমন সব চিত্তস্পন্দনের অনুভূতি আছে, গভীর ভাললাগার উপলব্ধি আছে যা শিল্পীমনকে রূপে রঙে রসে চিত্রে বাণীময় করে। অধ্যাত্ম ভারতবর্ষের পরম যে অনুভূতি হিমালয়ের কাছ থেকে তা পাওয়া। হিমালয়ের মধ্যস্থলে বসেই তাকে কেবল অনুভব করা যায়। সুন্দর আপনার ঐশ্বর্যে আপনি বিলীন এখানে।

অসম্পূর্ণ ছবিটা দেখতে দেখতে আমার কেবলই মনে হতে লাগল পাহাড়ের

কাছে হাত পাতলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। ভিখারীর মত হাত পাতা নয়, যোগীর মত হাত পাতলে তবেই শিল্পীর অনুভূতিতে সুন্দরের সাধনায় পরমের আত্মসমাহিত ভাবটি অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে। পাহাড়ের দৃশ্যপট আঁকতে আঁকতে শিল্পীর মধ্যেও কেমন একটা তদ্‌গত সাধকোচিত ভাব ফুটে উঠেছে। চারপাশের পর্বতমালার সাথে তখন এক নিশ্চিন্ত নীরবতায় মগ্ন হয়ে যায় সে।

কোথাও শব্দ নেই, স্পন্দন নেই, মানুষ নেই। নিশ্চল ঢেউয়ের মত শৈলমালা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আর শিল্পীর তুলি, রঙ, ভাবনা সৌন্দর্যের দেবতার আছে যেন প্রশ্ন করছে, মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে এই যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের কনকাঞ্চিত শ্বেত-শান্তশ্রী অপূর্ব সুষমা, মহিমার পানে স্বচ্ছ মহিষ রঙা মেঘমালা না থাকলে কি এমন সুন্দর হয়ে ফুটে উঠত হিমালয়ের তরঙ্গমালা? শিল্পীর ক্যানভাসে রঙের জাদুতে ফুটে ওঠে হিমালয়ের আর এক রূপ। কিছু আলো, কিছু ছায়া, আলো-কালোর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ক্যানভাসে জেগে ওঠে এক বিচিত্র তরঙ্গায়ন-শুভ্র শান্ত, ধ্যানস্থ এক যোগীর। নিশ্চল শৈলশিখরের তরঙ্গ রেখার ফাঁকে ছোট্ট একখণ্ড সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে। সেখানে উদলাপায়ে একটি মেয়ে পাহাড় দাপিয়ে ছুটে যাচ্ছে যেন। ফিনফিনে ওড়নার দুটি প্রান্ত দু'হাতে ধরা। পত্ পত্ করে বাতাসে উড়ছে। আর তার আগে আগে একটি যুবক যাচ্ছে বাঁশি বাজাতে বাজাতে।

ভীষণ ভাল লাগল। নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারলাম না। অধৈর্য হয়ে বললাম, আচ্ছা ভাই, তোমার হাতে জাদু আছে। কিন্তু এই ব্যঞ্জনাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু যদি ব্যাখ্যা কর, তা-হলে আমার উপকার হয়। মেয়েটি একবারও আমার দিকে না তাকিয়ে ছবির ওপর চোখ রেখে বলল : ছবির পটভূমিই হল সব, ব্যঞ্জনা তার প্রাণ। এখানে পাহাড়ের পর পাহাড়। এরা বড় একা। একটি পাখিও নেই এর আকাশে। কী যন্ত্রণাময় জীবন! তাই আমি বলতে চেয়েছি, গিরিশ্রেণী পরিবৃত হয়েও পাহাড়ও একা। একা থাকতে তার ভাল লাগে না। এই পাহাড় জড় নয়, তারও প্রাণ আছে। সে যে বেঁচে আছে সব কিছুর মতই এটা বোঝাতেই যেন দুরন্ত ঝরনাগুলো পর্বতের নীরবতা ভঙ্গ করে দুরন্ত উল্লাসে ধেয়ে যাচ্ছে অনন্তের পানে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বড় বড় শিলাখণ্ডকে প্লাবিত করে সে চলেছে। গিরিখাতের সংকীর্ণ সরণিতে কৃশাঙ্গ হয়ে সমগ্র শরীরে তুলেছে বঙ্কিম তরঙ্গের শিহরন। কোথাও প্রশস্ত জায়গা পেয়ে উচ্ছল চাপল্যে প্রাণের আনন্দে নৃত্য-পাগল হয়ে দৌড়ে চলেছে সমভূমির দিকে। সেই ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে উদলা পায়ে মেয়েটি ওড়না উড়িয়ে পাহাড় দাপিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে জানে না। বাঁশি বাজাতে বাজাতে যে

যুবক আগে আগে চলেছে তার সুর অনুসরণ করে সেও চলেছে এক বিরাট জীবন-স্রোতের অংশ হয়ে। গিরিশ্রেণী আর একা নয়, ঐ ঝরণা, স্রোতস্বিনী, গাছপালা, নদী-নালা, আকাশভরা সূর্য-তারা, চন্দ্র, মেঘও প্রকৃতির সঙ্গে এক বিরাট জীবনস্রোতের অংশ হয়ে আছে। আমি ওই তরুণ তরুণীকে সৌন্দর্যের মধ্যিখানে টেনে এনে ছবিটাকে আরো জীবন্ত ও রোমান্টিক করে তুলেছি।

দুর্দান্ত আইডিয়া। শিল্পীকে শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। ঘোড়ার সহিসের ব্যস্ততার জন্য বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না। অমরনাথ দর্শন করে আজ রাতেই ফিরতে হবে এখানে। এবং রাতটাও কাটাতে হবে এখানকার কোনো তাঁবুতে। বাধ্য হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসতে হল। কিন্তু ছবিটা মন জুড়ে রইল। যেতে যেতে বারংবার মনে হচ্ছিল; মানুষ আসে একা, যায়ও একা। ঝিনুকের দুটি খোলার মাঝখানে থাকে তার প্রাণকোষ। প্রাণনের ওই আনন্দটুকু পাওয়ার জন্য আমরা কেন, নিখিল বিশ্বেরও একা থাকতে ভাল লাগে না। অমন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তিনি এক হয়েও একা থাকতে চাইলেন না। রস পান না বলে, আনন্দরূপ প্রকাশ পায় না বলে রূপ, রস শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ দিয়ে তৈরি করলেন আর এক বিচিত্র বিশ্ব। এগুলো ছাড়া রসের ধারা বইবে কি করে? সৃষ্টির মূলে এই যে গভীর সত্য, ভারতীয় দর্শনে শিল্পী তার আত্মাকে আবিষ্কার করেছে। বোধ হয় পঞ্চতরণী হল সেই জায়গা যেখানে প্রকৃতির পায়ে যে ঘুঙুর বাজছে শিল্পী তা কান পেতে শুনেছে। প্রকৃতির হৃদয়ের কথাই যেন ছবিতে রূপে-রসে- রঙে বর্ণময় করেছে।

পঞ্চতরণীর পথে পথে বেশ কয়েকটি উঁচু খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হল। রাস্তা যে চড়াই উৎরাই তা বলা বাহুল্য। অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং অপরিসর। ঘোড়াও এই চড়াই উঠতে রীতিমত হাঁফিয়ে পড়ে। বারে, বারে দাঁড়িয়ে পড়ে বিশ্রাম নেয়। আবার চলে।

অনেকক্ষণ ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার দরুন শিরদাঁড়া টনটন করছিল। পা দু'খানা আড়ষ্ট এবং ভারি হয়ে গেছিল। এই পথটুকু যেতে পারলেই গুহা। দেবতার পদতলে বসে তখন একটু প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারব। এক সময় গুহার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ঘোড়াওয়ালার কাঁধে ভর দিয়ে গুহার প্রবেশ পথে পা রাখলাম। এখন শুধু সাম্রাজ্য জয়ের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেওয়ার অপেক্ষা।

সরু রাস্তার দু'পাশে পুজোর উপকরণ এবং নানারকম পসরা নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছে দোকানীরা। যাত্রী চলাচলের রাস্তা নেই বললেই হয়। এখনও ভিড় জমেনি তাই ঠেলাঠেলি করে যেতে হয় না। পরে এ পথ দিয়ে কাতারে কাতারে লোক কী করে যাওয়া আসা করবে আমার মাথায় এল না।

পনের হাজার উঁচু পর্বত শিখরের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে দু'শ চৌত্রিশের মত সিঁড়ি। ওঠা-নামা মিলে প্রায় পাঁচশ সিঁড়ি। ধাপে ধাপে নানা রঙের পোশাক পরা নানা দেশের লোক উঠছে এবং নামছে। নিচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে এই দৃশ্য দেখতে ভাল লাগছিল। মনুষ্যহীন বিজন প্রদেশে এই মানুষগুলো সিঁড়ির ধাপে ধাপে না পেলে নানা ভাষা, নানা পরিধান, বিচিত্রের মাঝে মিলন সকলের এই অনুভূতি কোথায় পেতাম? বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এমন প্রাণময় অমরনাথ ভারতবর্ষে আর কোনো তীর্থক্ষেত্রে নেই। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষার সীমারেখা মুছে গেছে। অমনি হাজার বাল্বের ফ্লাশ বাতি যেন আমার বুকের ভেতর আছড়ে পড়ল। পঞ্চতরণীর শিল্পীর কথা মনে পড়ল।

সত্যিই, ছবিতে পটভূমিই আসল। সব ক্ষেত্রেই বোধ হয় পটভূমি ছাড়া কোন কিছু জীবন্ত হয়ে ওঠে না। চতুর্দিকে পাহাড় বেষ্টিত মেঘলা আকাশের নিচে পাহাড়ের গায়ে রাক্ষসের মত মুখ ব্যাদান করে যে গুহায় অমরনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থান করছে বাইরে থেকে তার কোন বিশেষত্ব নেই যা তাকে অনির্বচনীয় করে তোলে। কিন্তু একজন ভক্ত কিংবা ঈশ্বর প্রেমিক সাধক যখন হৃদয়ের রঙে রাঙিয়ে তাঁর অনন্ত মহিমাকে মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে তখন তুষারলিঙ্গ অমরনাথ হয়ে ওঠেন ভক্তের কাছে জীবন্ত দেবাত্মা। সুন্দর একটা অনুভূতি হয়। এই একটিমাত্র অনুভূতির অনুপম বৃন্তে মূর্তিমন্ত হয়ে ওঠে সুন্দরের অনুপম অভিব্যক্তি। প্রাণের মাঝে সুরের ঢেউ তোলে। এক অজানা আকৃতি অন্তর জুড়ে বিরাজ করে। সেই ভাল লাগার মুহূর্তটা জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এরই নাম একাত্মবোধ।

কিছুক্ষণের জন্য আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল। এই আত্মবিস্মৃতির উৎস কোথায় জানি না। আড়াইশর মত সিঁড়ি ভেঙ্গে কী করে গুহা গৃহে পৌঁছব সেই ভাবনায় কিছুক্ষণের জন্য দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই, ভয় কেটে গেল। সম্মোহিতের মত সিঁড়ির ধাপের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বাবা অমরনাথের নাম স্মরণ করে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! মন্দিরের ধাপে মাথা রেখে জীবনে কোনদিন কোনো মন্দিরে প্রণাম করিনি। হঠাৎ আজ তাই করে বসলাম। কেন? ভয়ে না ভক্তিতে। বোধ হয় কোনটাই নয়। অন্য একটা ভাব আছে। ভেতরটা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তাই সিঁড়িতে মাথা রাখতে সারা শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে যে কী সব দ্রুত ঘটে গেল জানি না। বিচার বিশ্লেষণ করার মত মন ছিল না। নিজের ওপরও কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না আমার। ইসকেমিয়া থাকার জন্য সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় বুকে হাঁফ ধরে।

কষ্ট হয়। তিনতলা-চারতলা করলে যন্ত্রণা হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওসব কিছুই হল না। প্রতিটি ধাপ এক ফুটের মত উঁচু, এবং অসমান। খাড়া উঠে গেছে। ধাপগুলো এত ঠাণ্ডা যে পায়ের পাতা অসাড় হয়ে যায়। শীতে কনকন করে। অনেকেই ঘাসের চটি পরেছিল। জানতাম না বলেই খালি পায়ে হাঁটছিলাম। কোথাও না থেমে আড়াইশটা সিঁড়ি একটানা উঠলাম। আমার কোন শ্বাসকষ্ট নেই। বুকে কোন যন্ত্রণাও হয়নি। ফুরফুরে একটা আনন্দে ভেতরটা খুশিতে টইটুম্বুর। কী ভালই না লাগছিল! কনকনে ঠাণ্ডায় পায়ের পাতা অসাড় হয়ে যাওয়ার মত কোন অনুভূতি ছিল না। এমন কি এবড়ো-খেবড়ো অসমতল সিঁড়িও কাঁটার মত পায়ের নিচে ফুটছিল না। গুহার দিকে তাকিয়ে বাবা অমরনাথের জয়ধ্বনি দিতে দিতে ওপরে উঠতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল, আমার যেন হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কে। নিমেষে আড়াইশ সিঁড়ি উপরে উঠতে একটুও কষ্ট হয়নি, আবার একদণ্ড থামতেও হয়নি কোথাও। গুহায় পৌঁছে কেমন যেন হয়ে গেছিলাম।

নিজের ওপর একেবারেই আমার নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সমস্ত পথটাই একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আশ্চর্যের কথা গুহার যত নিকটবর্তী হচ্ছি আমার সারা শরীরের মধ্যে ততই একটা ভীষণ কাঁপুনি হচ্ছিল। এটা শীতের কাঁপুনি নয়। এক অনাস্বাদিত আনন্দ ও তৃপ্তিজনিত উল্লাস সারা শরীরের মধ্যে ঢেউ দিতে লাগল। নিজের অজান্তে দু'চোখ ভরে জল নামল। গুহার গর্ভ গৃহে পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। চোখের জলে সব অস্পষ্ট হয়ে গেল। লিঙ্গাকৃতি স্ফটিকশুভ্র তুষারস্তূপ থেকে বিচ্ছুরিত পুঞ্জ পুঞ্জ আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। গুহার ডান দিকে স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ অমরনাথ। উচ্চতায় পাঁচফুট হবে। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ শুভ্রতায় ঝলমল করছে। ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্যে লিঙ্গের সারা শরীর থেকে জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম, আমার চারদিক জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে! কী এক আশ্চর্য সুখে দেহমন ভরে যাচ্ছে। আমি আনন্দসাগরে ভাসছি। আলোয় ধোয়া জ্যোতির আলোয় আমি ডুবছি, উঠছি এবং ভাসছি। আমার এক আশ্চর্য অনুভূতি হল। পার্থিব কোন কামনা বাসনা আমার ছিল না। তাই অমরনাথের কাছে কোন প্রার্থনাও ছিল না। শ্বেতশুভ্র পাথরের বাঁধাই বেদির ওপর মাথা রেখে প্রাণভরে কেঁদেছি। দীর্ঘ বিরহের পরে প্রিয়জনকে কাছে পেলে যে প্রগাঢ় আনন্দ হয় এ হল সেই আনন্দানুভূতি। আনন্দ রূপম অমৃতম। জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনজনিত এক আশ্চর্য সুখে আমার দেহ-মন ভরে উঠছে। আমি আনন্দসাগরে ভাসছি। পরমের সঙ্গে যে অচ্ছেদ্দ নাড়ীর বন্ধন তাকে অনুভব করার সময় পায়নি। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে উপলব্ধি করলাম, তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট আমার মনের ভেতর

এত বেশি সুপ্ত ছিল যে আর্ত মনটি তাঁকে দেখামাত্র পুনর্মিলিত হওয়ার আনন্দে হাউ হাউ করে কাঁদল। অন্যের চোখে এর কোনো অর্থ-নেই। হয়তো হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু আমি তো বেদি স্পর্শ করে তাঁর আলিঙ্গন সুখ অনুভব করেছি। এতো বুঝিয়ে বলার ব্যাপার নয়। মন প্রাণ দিয়ে তাকে জানতে হয়। মনের মধ্যে মিলনের সে স্পর্শ লাগে তখন আর কোনো যুক্তি খাটে না। মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রেমসাগরের ঢেউর দোলায় আমি ডুবছি, উঠছি, ভাসছি। অমরনাথের কৃপা ছাড়া এ দুর্লভ ভাব জাগে না। মনে মনে বলেছি, তুমি আমার প্রাণের আরাম, মুক্তির আনন্দ। আমি ঈশ্বর দেখিনি। কিন্তু তোমার রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছে। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। সব কিছু মধুর স্মৃতি হয়ে উঠেছে। তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধুর নিঝর, মধুর সায়র আমার পরাণ দেবতা। তুমি আমার শুদ্ধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রণাম নাও।

কোথা দিয়ে অনন্ত সময় বয়ে গেল টের পাইনি। একটা অদ্ভুত ভাবাবেশে আচ্ছন্ন ছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য আমার কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। অমরনাথ থেকে ফেরার পথেও আমি ভাবাবেশ মুক্ত হতে পারনি। মাসাধিককাল ধরে আমার এই ভাবান্তর নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। কী আছে প্রকৃতি সৃষ্ট ওই তুষার স্তূপের ভেতর। গুহার ছাদের ফাটল থেকে চুঁইয়ে পড়া জলের ফোঁটা জমে জমে বরফের নীরেট কঠিন স্তূপ তৈরি হয়েছে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য হেতু এটি লিঙ্গাকৃতি রূপ ধারণ করেছে। এ কোন দৈব ব্যাপার নয়, ক্লোরাইড আর সালফেট অব ক্যালসিয়ামের গুঁড়োর রাসায়নিক যৌগিক প্রক্রিয়ার ফল। যেহেতু গুহাটি দক্ষিণমুখী তাই সূর্যরশ্মি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। ফোঁটা ফোঁটা জল জমে তৈরি হয় ওই শিবলিঙ্গ। তবু মানুষ ভাবাবেগে এত উন্মত্ত হয় কেন? স্বামীজিও বলেছিলেন তুষারলিঙ্গটি ছিল তাঁর কাছে সাক্ষাৎ শিব। ভক্তির আতিশয্যে তিনি এমন একটি অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যে ডাক্তারও সবিস্ময়ে তাঁকে বলেছিল আপনি জীবন-মৃত্যুর সীমানায় ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে আপনার হৃদযন্ত্র বন্ধ হবারই কথা। আপনার এনলার্জমেন্ট অব দি হার্টটাই স্বাভাবিক হয়ে গেল। অমরনাথ দর্শনের ঘোর কাটাতে স্বামীজির চার-পাঁচ দিন লেগেছিল। আমি যে বেদিতে মাথা রেখে কাঁদলাম সেও কি ভক্তির আতিশয্যে? কী মহিমা এই অমরনাথের! এর সান্নিধ্যে এলে অতি বড় নাস্তিকেরও হৃদয় গলে যায়? মানুষের কামনা বাসনা সব লয় হয়, পীড়িত হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। একী অমরনাথের মাহাত্ম্য, না পরিবেশের প্রভাব। অথবা অমরনাথ সম্পর্কে পূর্বতন ধ্যান-ধারণা কিংবা সংস্কার? বোধ হয় কোনটাই নয়। সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে যুক্তি-বিচার করে মনে হয়েছে, বিপদসঙ্কুল পর্বত, গিরিবর্ত্ম, গিরিসংকট, বিপজ্জনক

হিমবাহ, ধস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, বৃষ্টি, দুর্গম পথের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে গুহাগৃহে অমরনাথ দর্শন করার সঙ্গে একটা রাজ্য জয় করার গৌরব ও কৃতিত্বের কোন তফাত নেই। এ হল বিরাট সাফল্যের আনন্দ। বিরাট কিছু জয়ের আনন্দ, গৌরব ও তৃপ্তি। বোধ হয় সেই সুখে, আনন্দে, তৃপ্তিতে এবং গৌরবে আমার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। এসব কথা মনে হলেও হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে যে জীবন সার্থক করেছি এরকম একটা অনুভূতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হল। সমগ্র ভারতবাসীর মন জুড়ে বসে আছে অমরনাথের অমরকাহিনী।

অমরনাথের এই শিবলিঙ্গ দর্শনের জন্য কত কাল ধরে সুদূর অতীত থেকে কত পুণ্যলোভাতুর মানুষ, সত্যসন্ধানী মানুষ এসেছেন এখানে। এর রাস্তা অতি ভয়ংকর। পদেপদে মৃত্যুর আশঙ্কা। একবার পা পিছলে পড়ে গেলে হিমাবর্তে চির সমাধির সম্ভাবনা আছে। এখানে দুর্ঘটনা মানেই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার চির সমাপ্তি। তবু অমরনাথ যাত্রাটা অদ্ভুতভাবে আকর্ষণীয়। ভয় আর বিস্ময়ের কোলাকুলিতে বারংবার দোলা খেয়েও ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত না হয়ে উপায় নেই। মজার কথা, ভয়ে ভয়ে অতি সাবধান হতে গেলে অসাবধানতা যেন আরও পেয়ে বসে। অমরনাথে পৌঁছে, তুষারলিঙ্গ দর্শন করে তবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। এখানে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত দৃষ্টিটা ছিল সব সময় পায়ের দিকে। গুহার চাতালে দাঁড়িয়ে যখন চারদিকটায় চেয়ে দেখি, এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল বুকের ভেতরটা। কী ভয়ংকর রূপায়ণের ভূমিকা নিয়েছে প্রকৃতি। আনন্দ-সুন্দরের পরম অনুভূতি মিলে রূপ ও কল্পনার নির্মুক্তিতে এমনই অনির্বচনীয়তা প্রাপ্ত হয়েছে যে এখানে না এলে মন ভরে না।

মনের মনই জানে কি পেতে চায়। বোধ হয়, যা কিছু দুর্গম, অনধিগম্য তাকে পদানত কিংবা জয় করতে না পারলে মানুষের মন ভরে না। যতক্ষণ সে জয় না করে ততক্ষণ চলে তার অবিরাম যাত্রা। এই যাত্রার পিছনে কত আবেগ, কত মত্ততা থাকে। যতক্ষণ না বিজয়ী হচ্ছে ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই। তাই বিফল মানুষ পুনরায় মর্ত্যের স্বর্গভূমি অমরনাথের অমরলোকে আসে। কেন আসে? এ প্রশ্ন কেউ করে না নিজেকে?

অমরনাথের শিবলিঙ্গ দর্শন করে প্রত্যাবর্তনের পথে কত ধরনের অদ্ভুত চিন্তার স্রোত বইছিল মনের মধ্যে। নির্মুক্ত বিহারে মন যায় অরূপলোকে। যত পারে পাখা মেলে দেয়। চেয়ে চেয়ে দেখছি। দেখছি হিমালয়ের তরঙ্গমালা আর বিসর্পিল গিরিমালা। এই পর্বতমালাই তো শিবের বাসভূমি। দেবী পার্বতীকে নিয়ে এখানে বিরাজ করেন তিনি। তাহলে শিব অমরনাথ হল কেন? প্রশ্নটা একই সঙ্গে কাব্য ও

দর্শনের মেলবন্ধনে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কবির কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য ও শোভা। তুষারাবৃত পর্বতমালায় কল্পনা করা হয়েছে শিবের জ্যোতির্ময় অঙ্গ কান্তি! কালো শিলা আর বরফের সমাবেশে যে সাদা কালো ডোরা সৃষ্টি হয়েছে তা তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম পরনের বসন রূপে কল্পিত হয়েছে। হিমস্তর গলে গলে যে বিসর্পিল ঝরনাধারা নেমে আসছে শিখর থেকে তাই দেখে কবির ভাবনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে শঙ্করের জটাজুট। পর্বতরাশির ওপর সতত সঞ্চারমান যে জীমূতপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ে তাকে গঙ্গাবতরণরূপে কল্পনা করা হয়েছে। নীলবর্ণ পর্বত, বনরাজি কি-নীলকণ্ঠের নীলাভ গ্রীবাদেশের ইঙ্গিত? তুষার কিরীটের ওপর রবিকর পড়ে যে জ্বল জ্বল করে তাই কি তাঁর ত্রিনয়নের জ্যোতি? কী অপূর্ব ব্যঞ্জনা! প্রকৃতির রূপের মধ্যে বেদের ঋষি কবিরা খুঁজে পেয়েছেন ধ্যানের শিবকে। তিনি নির্জন পর্বতবাসী, সদা ধ্যানমগ্ন, নিত্য আত্মসমাহিত। আত্মানন্দে বিভোর। পর্বত আর শ্মশান তাঁর প্রিয়তম স্থান।

এই ভাবনার ওপর আলো পড়ে শিব হলেন অমরনাথ।—শিবো জ্যোতিরমোহমৃতম শিবই জগতের সর্বপ্রকাশক জ্যোতিঃস্বরূপ। শিবই বিশ্বের সারাভূত রস স্বরূপ—তিনিই জীবের চরমকাম্য অমৃতস্বরূপ। অনির্বাণ দীপই শিবের লিঙ্গের প্রতীক রূপ। এই লিঙ্গই শিবলিঙ্গ রূপে কল্পিত এবং শিলাকারে তার পরিকল্পনা। শিবলিঙ্গকে জ্যোতিলিঙ্গও বলা হয়ে থাকে। অমরনাথের তুষার শুভ্র জ্যোতিরূপ লিঙ্গই সেজন্য শিবরূপের সর্বোৎকৃষ্ট দ্যোতক। ওই জ্যোতিতে সমগ্র গুহাগৃহ উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ওই জ্যোতিস্বরূপই বিশ্বের প্রাণ, বিশ্বের আত্মা। তাই বিশ্বপ্রকৃতি ওই স্বয়ং জ্যোতিরই যোনিপীঠ। তাঁর আত্মবিলাস, আত্মারমণ, বিচিত্ররূপে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্র। তাঁকে দেখে, জেনে এবং তাঁর সাধনায় একাত্ম হয়ে জীব সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয় ও অমৃতত্ব লাভ করে। যোনিপীঠস্থিত শিবলিঙ্গ এই মূলতত্ত্বকে পরিস্ফুট করে। অমরনাথের শিবলিঙ্গের আধ্যাত্মিক রহস্যের এই ভাবনাতে আমার চিত্ত পরিপ্লুত হল।

আমার কল্পনায় অমরনাথের যে রূপায়ণ হল তা পুরাণে উল্লেখ নেই। তবু সেই একমেবাদ্বিতীয়ম জ্যোতির্ময় তুষারলিঙ্গ ভারতীয় পুরাণে শিবতত্ত্বের যে অনুপম অনুভূতিতে বাণীময় হয়ে আছে এ হল তার পরম উপলব্ধি। প্রকৃতির উন্মুক্ত পটে তাকে অনুভব না করলে, দর্শন পূর্ণ হয় না। 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা। প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে।' এমনিভাবে আমার আত্মদর্শন এবং অমরনাথ দর্শন হল।

নিরালা মনের অনন্ত আকাশে কত টুকরো টুকরো কল্পনা অঙ্কুরিত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে আবার লয় হচ্ছে। কত ধরনের কত যাত্রী চলেছে। তাদের ভাষা,

ধর্ম পোশাক পরিচ্ছদও আলাদা। সারা ভারতবর্ষ শুধু এই পাহাড়ভূমিতে এসে মিলিত হয়নি, একাকার হয়ে গেছে যেন। অখণ্ড ভারতবর্ষ, মহামানবের মিলনতীর্থক্ষেত্রের ভারতকে যদি কেউ দেখতে চায়, জাতি বর্ণ বিভক্ত সমাজের সংহত রূপ যদি উপলব্ধি করতে চায়ও তাহলে অমরনাথের পথেই তা দেখা হয়ে যাবে। মহাভারতের মহাধারা সম্মিলিত হয়েছে এক পরম একাত্মবোধে। অগণিত মানবাত্মা কদিনের জন্য সব বিবাদ বিসম্বাদ, ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলে এক মহাভাবের অনন্ত সমুদ্রে মিলে গেছে। প্রেমের দ্যুতিতে দেশী-বিদেশি, স্বধর্ম ও বিধর্মের মানুষ সেই একেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পরম সুন্দর হয়ে উঠেছে।

আবেশ মাখা চোখে চেয়ে আছি। পর্বতের শিখর থেকে উচ্চতর পর্বত শিখর দেখার এ যেন এক নূতন দৃষ্টি। অনন্ত নীল আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা তুষারমণ্ডিত উত্তাল শৈলশিখরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল স্বর্গ যেন ওখানে স্থির হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হয় ছোট ছোট অসংখ্য পাহাড় শ্বেত শুভ্র সোপান শ্রেণীর মত ডাইনে বাঁয়ে হয়ে স্বর্গের দিকে চলে গেছে। এই দৃশ্যকেই কি মহাভারতকার স্বর্গের সিঁড়ি মনে করেছেন। পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের যাত্রাপথের কবি কল্পনা কি এভাবে মহামুনি ব্যাসদেবের মনে জেগেছিল? এর অর্থ স্বর্গারোহণের পথটিও ছিল দুর্গম। অনেক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তবেই সেখানে দু'একজন পৌঁছতে পারে। অমরনাথের যাতায়াতের পথে এই কল্পনা আমার মন জুড়ে বসেছিল। বারংবার মনে হচ্ছিল, জীবনের অন্তিম পথ এই স্বর্গারোহণের পথ। পৃথিবীতে একমাত্র পাণ্ডবেরাই পায়ে হেঁটে স্বর্গারোহণে যাত্রা করেছিল। মৃত্যুর পরম মূল্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার যে দৃষ্টান্ত পঞ্চপাণ্ডব করে গেছে তা প্রত্যেক হিন্দুর কাছে পরম বিস্ময়। প্রত্যেক হিন্দুর সমস্ত অনুভবের মর্মবিন্দু। জীবনের স্পন্দন থেমে যাওয়ার আগে সে জেনে যেতে চায়।

"হন্তা ও হত, অজ্ঞতাবশে,"

মনে করে, তারা মারছে এবং মরছে;

জানে না আত্মা মারে না অথবা মরে না।" (কঠোপনিষৎ—চিত্রিতা দেবী/১/২/১৯)

অমরনাথের পথ যেমন দুর্গম তেমনি ভয়ংকর। তবু কী আকর্ষণীয়! চোখের সামনে দুর্ঘটনা দেখছে, মানুষ ও ঘোড়া মরছে, কত মানুষ ব্যর্থ হয়ে পথের মাঝখানে বসে পড়ছে। আশাভঙ্গ হয়ে ফিরে যাচ্ছে তবু সেই নির্মম সত্যকে অবহেলা করার ঔদাসীন্য ও মনোবল তীর্থযাত্রীদের এক নতুন জীবনানুভূতি দেয়। মৃত্যুর মত কঠিন ও বর্ণহীন সে অনুভূতি। কিন্তু এত স্বর্গ নয় স্বর্গত্বপ্রাপ্তি। তাহলে কি বুঝব,

পাণ্ডবদের মত অমরনাথের যাত্রীরা মৃত্যুভয় পরোয়া না করে দেহ অবসানের সুপ্ত বাসনা নিয়ে এই ভয়ংকর সুন্দর পথে যাত্রা করে। প্রকৃতির যে অবদানে মানুষের জন্ম ও জীবন তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াতেই তো মৃত্যুর পরম মূল্য। অমরনাথের অমরলোকে যাত্রা করে কি মানুষ মৃত্যুর মর্মান্তিকতাকে অপরূপ সুন্দর করে তুলতে চায় যাত্রার উন্মাদনার মাধুর্যে। কি জানি? স্বর্গারোহণের বিয়োগান্তক পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে মনটা আমার উদাস হয়ে গেল।

জীবন কী সুন্দর, কী আকর্ষণীয়, তবু মৃত্যুই জীবনের পরম পরিণতি। এই নির্মমতাকে হাসি মুখে অস্বীকার করার প্রয়াসেই পঞ্চপাণ্ডব স্বর্গারোহণ করেছিল। তাহলে কি বলব, এটাই ছিল মহাকবির মহাভারতের মেসেজ? অমৃতের পুত্রের মৃত্যু নেই। পর্বতারোহণের মত স্বর্গারোহণের এই অন্তিম পথ কি শুধু উত্তরণের পথ? মানুষের কাছে কঠোপনিষৎ-এর শেষ মর্মবাণী : অজো নিত্যঃ শাশ্বাতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। অর্থাৎ "শরীর ধ্বংস করিলেও কেহ ইহারে/মারিতে নারে। চির সনাতন নিত্য নবীন, জন্মরহিত শাশ্বত এই সত্য। (কঠোপনিষৎ-১/২/১৮)

মহাভারতের অন্তিমপর্বে পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ যেন এই কথারই বাণীরূপ। তাহলে আমার আমিত্বটুকু কোথায় থাকবে? যেদিন আমি নিস্পন্দ হয়ে যাব সেদিন 'কিছু নেই'—অনন্তশূন্যের এসব একটি কল্পনা কি আঁকা যায় মনের অনুভূতিতে? নিজের অজান্তে মনটা খারাপ হয়ে যায়। এই পৃথিবীতে একটা মানুষের মূল্য তা হলে কতটুকু? একটা বুদবুদের মত কি তার অন্তিম মূল্যায়ন। সূচনা ও সমাপ্তি! প্রারম্ভ ও পরিমাণ কথা দুটি মনেতে ঢেউ দিতে লাগল।

রাস্তার ধস নামার জন্য ঘোড়া ছেড়ে দিতে হল। শেষনাগ থেকে সহিস ঘুরপথে ঘোড়া নিয়ে রওনা দিল। এখন তিন কিলোমিটারের চড়াই উৎরাই পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হবে। ফলে এই পথটা আমি একা হয়ে গেলাম। কাদা থিক থিক করছে। পথ পিছল। নিজের ভাবনায় বিভোর হয়ে পা টিপে টিপে যাচ্ছিলাম। অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন আর অনুভূতি মনে ঢেউ দিয়ে গেল। কল্পনায় কল্পনাকে নিঙড়ে নিঙড়ে যেন বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, তাহলে এই পৃথিবী, মানুষ, প্রাণী সৃষ্টির মানে কি? কেন তুমি, কেন আমি? কেন প্রকৃতির এই অজস্র রূপায়ণ? তবে কি সবই মানবকল্পনার বিভ্রান্তিমাত্র? মনের তটে শুধু অসমাপ্ত জিজ্ঞাসার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ।

চলতে চলতে হঠাৎই পাথরের মত একটা ভারবোধ হল বুকের বাঁদিকে। তারপরেই দপদপানি বেড়ে গেল। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। যতখানি শ্বাস নেওয়ার জন্য বুকটা আঁকুপাঁকু করছিল, ততখানি নিতে না পারার জন্য যুগপৎ দম আটকান কষ্টে ও যন্ত্রণায় আমার শরীর কুঁকড়ে যেতে লাগল। বাধ্য হয়ে পাহাড়ের গায়ে ঠেস

দিয়ে দাঁড়ালাম। একটা পাথর খণ্ডের ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে রইলাম। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা। খোলা আকাশের নীচে টানটান হয়ে শুয়ে রাক্ষসের মত হাঁ করে পৃথিবীর যত বাতাস টেনে নিচ্ছি। তবু বুকটা ভরে উঠছে না। তবে কি পৃথিবী বায়ুশূন্য হল? কালো মেঘের আড়ালে সূর্য ঢেকে গেল। নীলগঙ্গার ক্ষিপ্ত ধারা থেকে জলতরঙ্গের মধুর সুরঝঙ্কার বাতাস বয়ে আনল না। পৃথিবী কি তবে বধির হয়ে গেল? সব স্পন্দন, গুঞ্জন ঝংকার কী থেমে গেল? অতলান্ত নিঃশব্দতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে আমার চেতনা। তবু কী আশ্চর্য আমার অনুভূতি! নিঃশেষ হওয়ার আগে এত কষ্ট পেতে হয়? তবু এই নির্মম, নির্দয়, নির্বিকার ভগবানের পদপ্রান্তে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলি তুমি সুন্দর! কী অনির্বচনীয় তোমার লীলা! তোমায় জানি না বলেই তো জানার জন্য এত কষ্ট স্বীকার। জীবন নিয়ে এই পরিহাস মানুষের, না দেবতার? না উভয়ের। আমার নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বের মধ্যেও চিত্ত ভরে শুরু হলো এক বিক্ষোভের মন্থন!

আমি তো মরে যাচ্ছি। তা হলে এই অনুভূতি কেন? কেন, তন্নতন্ন করে সব উপলব্ধি করা? সকরুণ সঙ্গীতের আকুল আবেদনের মত ও কোন সুর বাজছে আমার হৃদয়তন্ত্রীতে? ওপরের ছায়াঘন মেঘ তেমনি চিরচঞ্চল। নীল গঙ্গার অন্তহীন স্রোত ক্লান্তিহীন বয়ে যাচ্ছে। অনন্ত জীবন প্রবাহের মধ্যে কেবল আমিই স্থবির। আমার কোন আগ্রহ নেই, ঔৎসুক্য নেই, আকুতি নেই। তবু চেতনায় সমুদ্র মন্থন করে চলেছি কোন অমৃতলাভের প্রত্যাশায়? আমিই আমার জীবনের আশ্রয়, আমিই আমার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব, সব। তবু আমার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। পুণ্যের মতই নির্বোধ নিষ্ক্রিয় আমার অস্তিত্বের স্বতন্ত্র পরিচয়। অনন্ত শূন্যের এমন একটি অস্তিত্ব আঁকা হয়ে গেল মনে অনুভূতিতে। শূন্যতাই যদি সত্য হয় তা হলে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের বন্ধনে ধরা দিয়ে যিনি অনির্বচনীয়, যিনি অসীম, যিনি সৃষ্টি স্থিতির মধ্যে বিরাজমান তিনি তো নিজেকে নিজের প্রকৃতিকে অস্বীকার করছেন? একটা নির্বোধ অনুভূতিতে সমস্ত ভাবনা চিন্তা, অনুভূতি-উপলব্ধির ইন্ধন যেন নিরাকার হয়ে গেল! একটা ঘোরের মধ্যে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জর করেছি নিজেকে। অহরহ এই প্রশ্ন করছি কেন? উত্তর পাই না খুঁজে। মেঘের আবরণ সরিয়ে সূর্য ওঠে। মমতা মাখানো নরম রোদের আলোয় ঝলমল করছে গোটা পাহাড়ভূমি। মনে হল, অমৃতসাগরে আমি ভাসছি।

কোন ভাবে আমি আছি নিজেও জানি না। একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গেছে আমার সত্তা। বুকের খাঁচায় সূচ বিঁধে থাকার এক ভয়ংকর যন্ত্রণা ক্রমে নিশ্চল করে দিচ্ছে আমাকে। সময়ও যেন নিশ্চল হয়ে আছে আমার কাছে। অথচ

আমার মন থেমে নেই। অস্তিত্বহীনতার মধ্যে সে নিজেকে তন্নতন্ন করে খুঁজছে। প্রতিটি মুহূর্ত অনুভবে নতুন হয়ে উঠছে। অমরনাথের তুষারলিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে যে ভাবান্তর হয়েছিল স্বপ্নের মত আমি গভীর ঘুমের মধ্যে তা অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। অনুভূতি, চেতনা লুপ্ত হওয়ার আগে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় রূপের মধ্যে আমি পরমকে দেখেছি। তিনি কোন মূর্তি নন, বিগ্রহ নন, ভাবের দেবতা। কী জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব থেকে। আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আমার চোখ ভরে এ কোন অমরগঙ্গার স্রোত নেমে এল। কী আশ্চর্য, ওই জ্যোতিপুঞ্জের বেদিতলে মাথা নুয়ে স্থির হয়ে রইলাম। আমার কোন কামনা নেই, বাসনা নেই, প্রার্থনা নেই। আমার যা কিছু দুর্বলতা, যা কিছু দোষ সব স্বীকার করে আমি পবিত্র হয়ে উঠছি। আর সেই সুখের মধ্যে এক গভীর ঘুমে চোখ জোড়া জুড়ে আসছে। শরীরে অবসন্নতা নামছে। এক অতল অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে আমার চেতনা।

যন্ত্রণা, বুকে খিল এঁটে দিয়ে বসে আছে, তবু কি আশ্চর্য! বিধাতাকে নিষ্ঠুর ভাবতে পারলাম না। বরং মনে হল, তিনি করুণাময় না হলে অনুভূতি-উপলব্ধিকে এমন চিরে চিরে বিশ্লেষণ করতে পারতাম! তিনি যা করেন তার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকে। আমরা তা বুঝতে পারি না বলেই ঈশ্বরকে নির্মম, নিষ্ঠুর বলি। স্বরূপে তিনি দয়াময়, করুণাময়। কেবল উপযুক্ত পটভূমিতেই তা গভীর করে অনুভব করা যায়। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে আমার রক্তের কল্লোলে কার অশ্রুত স্বর শুনতে পেলাম। কে যেন দরদী গলায় ডাকল—বেটা ওঠ! আমি এসেছি। এই চানাটা খেয়ে নে। তোর সব যন্ত্রণার অবসান হবে।

বিদ্যুৎ চমকের মত যন্ত্রণার তরঙ্গ বয়ে গেল স্নায়ুর শিকড়ে শিকড়ে। তবু ওই ডাকে চোখের পাতা বুকের ভেতরটা প্রত্যাশায় কেঁপে যায়। বার কয়েক কথাটি শোনার পর বহু কষ্টে চোখ মেললাম। আমার শিয়রের ধারে শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এক সাধুকে দেখলাম। তারপরেই চোখ দুটো আবার বুজে এল কষ্টরুদ্ধ যন্ত্রণায়। দাঁতে দাঁত দিয়ে খিল ধরা বুকের যন্ত্রণার সঙ্গে প্রাণপণে যুঝছি। চোখের কোন বেয়ে জল পড়ছে। দেহ নিস্তেজ হয়ে আসছে। ক্রমে সন্ন্যাসী আমার শিয়রের ধারে বসে আছে তখনও। মমতাভরা কণ্ঠে পুনরায় বলল : ব্যাটা, চানাটা নে। তোর কোন কষ্ট থাকবে না আর।

কী আশ্চর্য, তবু সংশয় কাটে না, সন্দেহ যায় না। অবিশ্বাসে মুখ ঘুরিয়ে রইলাম। মনের ভেতর সাধুর সততা, আন্তরিকতা নিয়ে হাজার প্রশ্ন। সাধু হয়ত আমার অসুস্থতার সুযোগ নিচ্ছে। কিছু একটা করে আমার সর্বস্ব হরণ করবে। পাথেয় খোয়া

যাওয়ার আশঙ্কায় সাধুর আহ্বানে সাড়া দিলাম না। ঘোরের মধ্যে হঠাৎ চৈতন্যোদয় হল— দেবতার কোন অনির্বচনীয় লীলা নয়ত! স্বয়ং অমরনাথ হয় তো সাধুবেশে এসেছেন আমার কষ্ট লাঘব করতে। তবু বোধ বুদ্ধি বলল : ও কিছু নয়। ভাবনার বিভ্রান্তি মাত্র। মনের মন সেই সময় ভর্ৎসনা করে বলল : মরতে তো বসেছ এখনও অবিশ্বাস গেল না। বিশ্বাস করে যদি ঠকতেও হয় তাতেই বা ক্ষতি কি। তুমি তো মরছ। মরাটা একটু ত্বরান্বিত হবে তাতে। মরতে যখন হবেই তখন ওই চানাটুকু খেতে অসুবিধে কি? হাত পেতে নাও। শ্রদ্ধায় না পার, চাঁদ সদাগরের মত না হয় অশ্রদ্ধা করে কথাটা মানলে। তাতেও তো পূজোর ফুল উপাসিতের পায়ে পড়বে।

অপ্রকাশ্য অনুশোচনায় এবার হাতটা বাড়িয়ে ধরলাম সাধুর দিকে। একবারও সাধুর মুখখানা ভাল করে দেখলামও না। অবজ্ঞার সঙ্গে চানা দাঁত দিয়ে কামড়াতেই কাজু বাদামের স্বাদ পেলাম। সেই সঙ্গে একটা সুমধুর সুবাস বাদামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। যে সুবাস কাজুর নয়। ওই সুবাস আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে মর্ত্যের কোন খাদ্যবস্তুতে পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঘুম পাড়ানির কোন ওষুধ আছে সন্দেহ হল। বিশ্বাস করে সাধুর দেওয়া চানার বাকি অর্ধাংশটুকু মুখে দেব কিনা এই প্রশ্নে নিজেকে শুধু জর্জরিত করছি। আবার মন ভর্ৎসনা করল : যে বিশ্বাস করলে তুমি নতুন করে জীবন পেতে পার, সেই বিশ্বাস নিয়ে এত সংশয় কেন? লোক তো খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে। তোমার কি আছে যা নিয়ে তুমি এত সাবধান। পথে মরে থাকলে তোমার পাথেয় কে আগলাত? যাঁর কৃপায় তুমি এখানে এসেছ তিনিই তোমার রক্ষাকর্তা। তাঁকে বিশ্বাস কর। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। প্রশ্ন কর না—দেবতার অনির্বচনীয় লীলা তোমার মত মূর্খে বুঝবে না।

মনের ধমক খেয়ে চৈতন্যোদয় হল। গৃহিণীর মুখখানা সহসা ভেসে উঠল চোখের তারায়। আমার চৈতন্যের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেলাম! বাবা, অমরনাথের হাতে তোমার সব দেখাশোনার ভার সঁপে দিয়ে আমি পরম নিশ্চিন্তে আছি। তিনিই তোমাকে দেখবেন। সেই ভরসায় বড় মুখ করে, আর সাহস করে তোমাকে বাবার কাছে পাঠিয়েছি। তুমি ভালভাবে ফিরে না এলে আমার মুখ রক্ষা হবে না। আমি নিজেকেও ক্ষমা করতে পারব না। দুর্বল মন তো—তাই যতদিন না ফিরছ ততদিন বাবা অমরনাথের মুখে তোমার মুখ দেখব।

বিদ্যুৎ চমকানোর মত কী যেন ঘটে গেল আমার অন্তঃরাজ্যে। সব দ্বিধা, সংশয় নিমেষে দূর হয়ে গেল। বাকি অর্ধেক চানাটা মুখে দিলাম। সেই অনাস্বাদিত স্বর্গীয় গন্ধ আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর আমার বুকের কষ্ট একটু একটু করে লাঘব হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে

বুকভরে আবার শ্বাস নিতে পারলাম। আমি সুস্থ বোধ করলাম। শরীরটা চাঙ্গা হলে উঠে বসলামও, কিন্তু আমার শিয়রের পাশে কিংবা আশপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কোন সাধু দেখতে পেলাম না। এক অত্যাশ্চর্য আধ্যাত্মিক বোধে মন আবিষ্ট হল। সাধুকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারার জন্য অনুশোচনায় মন ভারাক্রান্ত হল। সারাটা পথ এই দৈবানুগ্রহের কথা ভেবে পুলকিত হয়েছি। পর্বতশীর্ষের দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু তাঁর কথা ভেবেছি। মুগ্ধ মনটাকে অনুভবের নিঃসীমতা থেকে আমার কাছে টেনে এনে বারবার বলতে থাকি—তুমি না চাইলে তো আমার এখানে আসা হত না। কেন তোমার কাছে টেনে আনলে তুমি জান? অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই পথে তুমি টেনে এনেছ। তোমার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে আমাকে চিনিয়েছ তুমি। হিমালয়ের উন্মুক্ত পটে তোমাকে অনুভব করতে না পারলে, হে ত্রিভুবনেশ্বর আমার অমরনাথ আসা অপূর্ণ থেকে যেত।

হঠাৎ আমার দুই চোখের উপরে বাঁকা ধুনকের মত শ্রীমতীর দু'খানি ভুরু রেখা ভেসে উঠল। আমার তৃপ্তিতে, সুখে ও খুব খুশি হয়েছে। তাই চোখে তার কৌতুক, মুখে টেপা হাসি। আমার ভাবনার কাছে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল। মানে ওর কথাগুলো আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। চোখের তারায় দেখতে পাচ্ছি, আমার দমদমের বাড়ির শোবার ঘরের ছবি। বিছানায় বসে আছে ইলা। বলছে : চমৎকার! অমরনাথ যাবার আগে কত কথা বললে—সব কিছুর উৎস তুমি। তোমার প্রেরণা ছাড়া আমার যাওয়া হত না। আমার যা কিছু আনন্দ, সুখ, গন্ধে-গানে, রূপে-রসে, স্পর্শে তা সবই তোমার কাছে পাওয়া। তুমি আমাব আর্ট, আইডিয়া, আমার কল্পনার বাণীরূপ। তুমি সব। তুমি দাও ভাব, বর্ণ, রঙ, ভাষা। এখন তো বেমালুম সে সব কথা ভুলে গেছ। তোমার নিজের মনের রূপায়ণে কিন্তু আমার কোন ভূমিকা নেই। সবই তোমার কাছে এক অনির্বচনীয়ের লীলা এখন।

চমকে উঠলাম আমার ভাবনায়। কল্পনার তন্ময়তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে তারস্বরে চিৎকার করে বললাম : আমার এই আইডিয়া, আমার ভাবনা-চিন্তা কি পরোক্ষে তোমার অনুধ্যান নয়। আমার চোখ দিয়ে তুমি অমরনাথ দেখতে চেয়েছিলে; সেই চোখ, মন তো তোমারই সৃষ্টি। নইলে, আমার নীরব প্রাণের দেবতাকে দেখা তোমার অনুভূতি হয়ে উঠবে কী করে? আমার কল্পনাতে, লেখনীতে, চিন্তায় তোমারই প্রেরণা, তোমারই বাণী। ধায় মোর সকল ভালবাসা তোমার পানে তোমার পানে।